পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI

মঙ্গলবার, ২৫ এপ্রিল ২০১৭

উত্তরণ

৮ পাতার এই রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

আপনার সন্তান অবসাদের শিকার নয়তো?

তনুশ্রী দাস

যে কোনও শিশুর হাসিমুখ মানুষের যে কোনও বেদনা, দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে তাকে হাসিখুশি করে তুলতে পারে। কিন্তু আধুনিকতার উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে শিশুদের মধ্যে অবসাদ বা ডিপ্রেশন বেড়েই চলছে তাতে সকলেরই কপালে চিন্তার ভাঁজ। যাদের আমরা ফুলের সঙ্গে তুলনা করি তারাই যদি মুখ গোমড়া করে, মুখ লুকিয়ে, নিজেকে আড়াল করে রাখে তবে সকলের মাথা ভার তো হবেই।

রাগ, দুঃখ, অভিমান এইসব আবেগ শুধু বড়দের অনুভূতি নয়। ছোটদেরও এইসবে মুখ গোমড়া হয়। তারাও মুখ ফুলিয়ে রাগ করে, জেদ করে। কিন্তু কিছু কিছু শিশুর মধ্যে এই আবেগগুলো দীর্ঘস্থায়ী বা এতটাই তীব্র হয় যে এর নেতিবাচক প্রভাব তাঁদের মানসিক ও চারিত্রিক স্বাস্থ্যের ওপর পড়ে। তারা নিজেকে গুটিয়ে নেয় বা কখনও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, যা পরবর্তী জীবনে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিশুরাও অবসাদের কবলে আটকে নিজের স্বভাবজাত ভাবনা, চিন্তা, আচার, ব্যবহার সবকিছুর খেই হারিয়ে ফেলে।

একে তো আমরা অনেকেই মানি না যে পাগল না হয়ে এমনি মন খারাপ হলে সেটাও একটা অসুখ! তা অনেক সময়েই একা একা মোকাবিলা করা যায় না। যাঁরা তা ভাবতে পারেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ আবার অবসাদকে সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের সমস্যা ধরে নেন। ছোটদের মন খারাপ হতে পারে এ কথা বড়দের মাথাতেই আসে না ফলে অনেক সময়েই শিশু এবং টিন-এজারদের মধ্যে ডিপ্রেশন সঠিকভাবে চিহ্নিত হয় না। কারণ, ছোটদের মন খারাপ তো কিছু খেলনা বা চকোলেট কিনে দিলেই ঠিক হয়ে যায়—কিছু না হলে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাওয়া—এই হল সব বড়দের ধারণা। কিন্তু যদি আমরা একটি শিশুর মধ্যে তার স্বাভাবিক ব্যবহারে হঠাৎ কোনও পরিবর্তন দেখি তবে যেমন শিশুটির শরীরের গোলযোগের সম্ভাবনার কথা ভাবি তেমনই তাঁর মনে কোনও গোলমাল ঘটল কি না তা ভাবাও আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, হঠাৎ করে পড়াশোনায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলা বা স্কুলের পরীক্ষায় ক্রমশ খারাপ ফল করাও অবসাদের একটা লক্ষণ হতে পারে। স্কুলে যেতে না চাওয়া, অলস ভাব, খিদে আর ঘুম কমে যাওয়া, চিন্তাশক্তি কমে যাওয়া, কারণে-অকারণে বিরক্তি, কান্নাকাটি, মাথা ব্যথা বা পেট ব্যথার মতো কিছু শারীরিক উপসর্গ যার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—এসবই যে কোনও মানুষের গভীর মন খারাপ থেকে শুরু হতে পারে। এমনকী খেলাধুলো, টিভি দেখা, ঘুরতে যাওয়া, বাড়িতে লোকজনের আনাগোনা—সবকিছুই তার কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। বাড়ির সকলের প্রিয় মানুষটি সকলকে এড়িয়ে নিজেকে আড়াল

এরপর দু'য়ের পাতায়

দুইয়ের পাতায়
বিশেষ প্রবন্ধ
আমাজন অরণ্য
তিনের পাতায়
ক্লাস নাইন-এর টিউশন
ভূগোল ও ইতিহাস
চারের পাতায়
ক্লাস টেন-এর টিউশন
ভূগোল ও ইতিহাস
পাঁচের পাতায়
স্পেশাল টিউশন
কম্পিউটার ও ইংলিশ গ্রামার
ছয়ের পাতায়
ক্যুইজ ও জেনারেল নলেজ
সাত ও আটের পাতায়
হেল্‌থ টিপস
এডু টিপস
জেনারেল নলেজ
আটের পাতায়
জেনারেল নলেজ
আল-গোর

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

পড়ার আগে প্ল্যান করে নাও

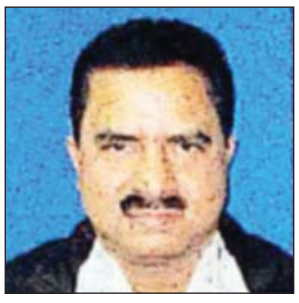

নারায়ণ মজুমদার প্রধান শিক্ষক, নগাঁও বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কৌতূহলী হতে হয়। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের কিছু জিজ্ঞেস করতে সংকোচ বোধ করে। এই সংকোচ থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে। তারা যত বেশি প্রশ্ন করবে তত বেশি শিখবে। শিক্ষকদের প্রশ্ন না করে অসুবিধা এড়িয়ে গেলে নিজেদেরই এর ফল ভোগ করতে হবে। কেননা, বিষয়টি না বুঝে যদি শুধু মুখস্থ করে তাহলে কোনও লাভ হয় না। পড়া বুঝে তা মুখস্থ করতে হবে। এছাড়া, নিয়মিত স্কুলে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ কোনও অসুবিধা ছাড়া রোজ স্কুলে গেলেই পড়ার প্রতি আকর্ষণ থাকবে। একটা কথা ছাত্রছাত্রীদের মাথায় রাখতে হবে যে, একদিন স্কুলে না আসা মানে এক দিনের ক্ষতি নয়, বরং সাতটা ক্লাসের ক্ষতি। এই কথাটা বুঝতে পারলেই তারা স্কুল আসার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।

অন্যদিকে, সাধারণত দেখা যায় ছাত্রছাত্রীরা সব বিষয় পড়লেও, অঙ্কের প্রতি তেমন আগ্রহী হয় না। তাই বিষয়টি এড়িতে যেতে যেতে একটা সময় অঙ্ককে তারা খুব ভয় পেতে শুরু করে। দেখা যায়, অনেকেই রবিবার বা ছুটিছাটার দিনে অঙ্ক নিয়ে বসে। এমন করলে চলবে না। অঙ্ক রোজ প্র্যাকটিস করতে হবে। পাশাপাশি, রোজ স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যা পড়ান, বাড়ি ফিরে সন্ধ্যাবেলায় সেই চ্যাপ্টারগুলো একবার পড়ে নিতে হবে। তাহলে

এরপর তিনের পাতায়

'উত্তরণ'-এর মুখোমুখি | রোল নং ওয়ান

রোজকার পড়া রোজ করে নিই

অলীক মণ্ডল অষ্টম শ্রেণি, ভাতজাংলা কালীপুর হাই স্কুল

অলীক স্কুলের সব শিক্ষকদের খুব প্রিয়। মন দিয়ে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে তার ভালোই লাগে। টিভিতে বরং মন নেই। বাবা একজন রাজমিস্ত্রি। নানা আর্থিক টানাটানি থাকলেও তিনি মেয়ে আর ছেলের পড়াশোনায় যে কোনও রকমের প্রয়োজন মেটাতে অভাব রাখেননি। তার মা-বাবা প্রথাগত শিক্ষায় হয়তো সামান্যই শিক্ষিত। বাবা সারাদিন রোদে-জলে কাজ করেন আর মা সারাদিন ঘর সামলান। কিন্তু মা তার পরেও পড়াশোনার খোঁজখবর নেন। পড়াশোনা করে সে তাদের পরিবারের এই অবস্থার পরিবর্তন করতে চায়। পড়াশোনায় সাফল্যের জন্যে সে এখন থেকেই পরিকল্পনামতো চলছে। পড়াশোনা নিয়ে তার ভাবনা-চিন্তা সে উত্তরণ টিমকে জানাল।

উত্তরণ: পড়া ভালো করে রপ্ত করতে তুমি কী করো?

অলীক: আগে বারে বারে পড়ে ভালো করে বুঝে নিই। তারপরে লিখে নিই। না লিখলে আমার পড়া মনে থাকে না।

উত্তরণ: তোমার পড়ার রুটিন কী?

অলীক: সকালে উঠে স্কুলে যাওয়ার আগে ৭ থেকে ৯টা অন্তত পড়ি। স্কুলের পর ১ ঘণ্টা খেলি তারপর ক্লান্ত লাগলে একটু বিশ্রাম নিই। তারপরে পড়তে বসি। রাতে এমনি সময়ে ১০টা অবধি পড়ি।

উত্তরণ: সহজে পড়া করার তোমার উপায় কী?

অলীক: রোজকার পড়া রোজ করে রাখলে আমার সুবিধে হয়।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় বিষয় কী?

অলীক: বাংলা আর ইংরেজি আমার সবথেকে ভালো লাগে।

উত্তরণ: ইংরেজি রপ্ত করতে তুমি কী করো?

অলীক: নতুন নতুন ইংরেজি লেখা রিডিং পড়ি।

উত্তরণ: পড়াশোনা ছাড়া আর কী করতে ভালো লাগে?

অলীক: খেলা ছাড়াও আমার বই পড়তে ভালো লাগে। স্কুলের লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে আমি পড়ি। টিভি দেখতে আমার ভালো লাগে না। তবে মাঝে মাঝে কার্টুন দেখি।

উত্তরণ: তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও?

অলীক: শিক্ষক।

উত্তরণ: শুভেচ্ছা রইল যে তুমি যেন সব স্বপ্ন পূরণ করতে পারো।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৫ এপ্রিল ২০১৭

জেনারেল নলেজ

আমাজন অরণ্য

আমাজন অরণ্যের নাম আমাদের সবার শোনা; আবার ছোটবেলায় স্কুল বইতেও আমাদের এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে পৃথিবীর সবথেকে বড় অরণ্য হিসাবে। শুধু তাই নয়, এই বিশাল জঙ্গল দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী বিধৌত অঞ্চলে অবস্থিত। এই অরণ্য ৭০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার অববাহিকা বেষ্টিত। তবে এই ৭০ লক্ষ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে প্রায় ৫৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার আর্দ্র জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত। এই অরণ্য এতটাই বিশাল যে মোট ন'টি দেশ জুড়ে এর অবস্থান। এই আমাজন অরণ্যের ৬০ শতাংশ রয়েছে ব্রাজিলে। ১৩ শতাংশ রয়েছে পেরুতে আর বাকি অংশ খণ্ড খণ্ড ভাবে রয়েছে কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, গায়ানা, সুরিনাম এবং ফরাসি গায়ানাতে। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ৪০ শতাংশ এই বনের দখলে। এই আমাজন বন অত্যন্ত দুর্গম। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে শতাংশ পরিমাণ রেইনফরেস্ট আছে তার অর্ধেকটা এই অরণ্য নিজেই। শুধু তাই নয় এই অরণ্যে দিয়েছে নানা রকম প্রজাতির প্রাণীকে বাস করার জায়গা। এই বনে আছে ৩৯০০০ কোটি গাছ। যেগুলো প্রায় ১৬০০ প্রজাতিতে বিভক্ত।

ইতিহাস: প্রাচীনকাল থেকেই নানা যুগে নানা দেশের লোকে পাড়ি দিয়েছে আমাজনের জঙ্গলে। মূলত, সোনা রুপো ও নানা রকম ধনরত্নের খোঁজে। পর্তুগিজ অভিযাত্রীরা বিশ্বাস

© Alamy

করতেন এই আমাজনের জঙ্গলের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে এলডোরাডো নামে এক প্রাচীন শহর যা নাকি পুরোপুরি সোনা দিয়ে মোড়া। এই ভুল ধারণাটা জন্মেছে প্রাচীন গ্রিক পৌরাণিক গল্প থেকে। এই প্রাচীন গল্পে বর্ণনা আছে, এই আমাজন জঙ্গলে অবস্থিত এলডোরাডো নামক শহরটি পাহারা দেয় এক বিশেষ শ্রেণির নারী যোদ্ধারা। এই বিশেষ নারী যোদ্ধাদেরই গল্পে অভিহিত করা হয়েছে আমাজন নামে। পর্তুগিজ, স্প্যানিশ এবং ফ্রেঞ্চ অভিযাত্রীরা এককালে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন এই এলডোরাডো শহর আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউই এই কাল্পনিক শহরের আবিষ্কার করতে পারেননি কারণ বাস্তবে এরকম কোনও শহর নেই। তবে শহরের সন্ধান না পেলেও লোককথায় স্থায়ী হয়ে যায় এই গ্রিক নারী যোদ্ধাদের নাম। সেই বীর নারী যোদ্ধাদের নাম অনুসারেই এই জঙ্গলের নাম হয় আমাজন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়: তবে ভয়ের বিষয় হল যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিজ্ঞানী আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে এই অরণ্য বিলীন হয়ে যাবে। আর এর জন্য দায়ী হবে মানুষের যথেচ্ছাচারে গাছ কাটা। এককথায় যাকে বলে বন নিধন। পেনসিলভেনিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানের অধ্যাপক জেমস এলকক বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, জটিল প্রতিক্রিয়া নামক পরিবেশ প্রক্রিয়ায় এমনটা ঘটতে পারে।

গুরুত্ব: আমাজন অরণ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এই জঙ্গলকে আমাজন রেইন ফরেস্ট বলা হলেও এর অর্থ এই নয় যে, এখানে সারা বছর বৃষ্টি হয়। এই জঙ্গলকে রেইন ফরেস্ট বলার কারণ হল এর অত্যাধিক আর্দ্রতা, মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত এবং গরম আবহাওয়া। এই অরণ্য শুধু যে উদ্ভিদের সংস্থান দেয় তাই নয় পৃথিবীর ২০ শতাংশ অক্সিজেন আসে এই আমাজনের জঙ্গল থেকে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক আশ্চর্যের মধ্যে আমাজনের জঙ্গল সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। এই অরণ্য গড়ে উঠেছে যে নদীকে কেন্দ্র করে সেই আমাজন নদী অন্য বহু নদীর উৎস। এই নদী পৃথিবীতে জলের জোগান দেয় প্রচুর পরিমাণে। এছাড়া এই জঙ্গলে আছে প্রায় ৪৫ লাখ প্রজাতির পোকামাকড়। আছে ৪২৮ প্রজাতির উভচর প্রাণী। ৩৭৮ প্রজাতির সরীসৃপ আর আছে ৪২৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। এছাড়া আমাজন নদীতে ৩০০০ প্রকৃতির মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী আছে। তবে মজার বিষয় হল, হাজারও রকমের প্রাণীর সমাহার থাকলেও এখানকার ইকো সিস্টেম অত্যন্ত শক্তশালী যা হাজার বছর ধরে টিকে আছে। এখানকার স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাগুয়ার, গোলাপি ডলফিন—এটি একমাত্র প্রজাতির ডলফিন যা স্বাদু জলে বাস করে। এছাড়া আছে তামানডুয়া, তাপির, মানাতি, ইঁদুর, কাঠবেড়ালি, বাদুড় ইত্যাদি।

পাখিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঈগল, টুকান, হোয়াটজিন, দ্রুতগামী হামিং বার্ড এবং আরও রং-বেরঙের পাখি।

সরীসৃপদের মধ্যে আছে বিখ্যাত সাপ বোয়া যা তার শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে। এছাড়া আছে কুমির, অ্যালিগেটর, কচ্ছপ ইত্যাদি।

মাছের মধ্যে আছে মাংসাশি লাল পিরানহা, বিপদজনক বৈদ্যুতিক মাছ এবং স্বাদু জলের অন্যতম বড় মাছ পিরারুকু যার ওজন ১৫০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির পিঁপড়ে, হাতের তালুর সমান বড় তেলাপোকা, রং-বেরঙের প্রজাপতি নানারকম শুঁয়োপোকা ও আরও নানা রকম প্রাণীর স্বর্গরাজ্য আমাজনের জঙ্গল।

উপজাতি: এই বনে বাস করে তিনশোর বেশি প্রজাতির মানুষ। এদের বেশিরভাগ মানুষই ব্রাজিলীয়। এরা পর্তুগিজ স্পানিশ ইত্যাদি ভাষায় কথা বলে। এছাড়াও রয়েছে এদের নিজস্ব কিছু ভাষা। এদের মধ্যে কিছু প্রজাতির মানুষ আছে যাযাবর। এই জঙ্গলে বাস করা মানুষগুলোর বাইবের জগতের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ নেই।

আমাজন বনের কিছু বিস্ময়কর তথ্য:

- বিশ্বের নিরক্ষীয় বনের অর্ধেকের বেশি অঞ্চল এই আমাজনে অবস্থিত।
- প্রাণিজগতের যাদের শনাক্ত করা গেছে তাদের এক-দশমাংশ এই বনে বাস করে।
- পৃথিবীর সকল পাখির এক-পঞ্চমাংশ পাখি এই জঙ্গলে বাস করে।
- গড়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৭৫০০০ বৃক্ষ পাওয়া যায় এই বনে।
- বিশ্বের সমস্ত ওষুধের ২৫ শতাংশ কাঁচামাল আসে এই বনের মাত্র ৪০০ প্রজাতির গাছ থেকে।
- পেরুর একটি মাত্র গাছে ৪৩ প্রজাতির পিঁপড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে যা সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনের থেকেও বেশি।

আমাজন নদী ও তার কয়েকটি বিস্ময়কর তথ্য:

নীলনদের পরে এই নদী পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী। এর প্রায় ১,১০০টি উপনদী আছে। এই উপনদীগুলির মধ্যে ১৭টির দৈর্ঘ্য ১০০০ মাইলের বেশি। এই নদী আমাজন অঞ্চলে গড়ে ওঠা জঙ্গলের প্রাণবৈচিত্রের প্রধান উৎস।

- এই নদীর আয়তন আমেরিকার সবচেয়ে বড় নদী মিসিসিপির আয়তনের ১১ গুণ।
- বর্ষা মরশুমে এই নদীর মুখ আটলান্টিকের সঙ্গে যেখানে মিলিত হয় সেই জায়গা প্রায় ৩০০ মাইল চওড়া থাকে।
- আমাজন নদী দিয়ে যে পরিমাণ জল প্রতিদিন প্রবাহিত হয় তা দিয়ে পুরো নিউ ইয়র্ক শহরের পুরো ৯ বছরের জলের চাহিদা মেটানো সম্ভব।
- এই নদীতে জলের প্রবাহের গতিবেগ এত বেশি যে আটলান্টিকে প্রবেশের পর তা নোনা জলের সঙ্গে মেশার আগে সমুদ্রের বুকে ১২৫ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে।
- প্রতিদিন ১০৬০ লক্ষ ঘনফুট পলিমাটি আমাজন জলের সঙ্গে আটলান্টিকে গিয়ে পড়ছে।
- পৃথিবীর মোট স্বাদু জলের এক পঞ্চমাংশ জল আসে আমাজন নদী থেকে।

প্রিয়াংকা দাস

আপনার সন্তান অবসাদের শিকার নয়তো?

প্রথম পাতার পর

করে রাখতে শুরু করলে আর দেরি না করে বুঝে যেতে হবে এমন কিছু তার মনের ভেতরে চলছে যার সুরাহা বাড়ির কেউ বা সে নিজেও হয়তো করে উঠতে পারছে না।

শিশুদের অবসাদের মূল কারণ হিসাবে একাকিত্ব, স্বাধীনতার অভাব, তার ক্ষমতার বাইরে চাপ সৃষ্টি করা বা কখনও তার ক্ষমতাকে স্বীকার না করা হতে পারে। এছাড়া অনেক শিশুই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার। তার মাত্রা এবং হার শিশুর অবসাদের তীব্রতা স্থির করে। আবার বাড়িতে মা-বাবা বা অন্য বড়দের কোনও সমস্যাও অনেক সময়ে ছোটদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। পরিস্থিতি এমন যে প্রতিদিনই নাকি ডাক্তারদের কাছে মানসিক সমস্যা নিয়ে দুই থেকে তিনটে শিশু আসেই। দু'বছরের শিশুদেরও এই অবসাদের শিকার বলে ঘোষণা করতে ডাক্তাররা বাধ্য হয়েছেন।

দুশ্চিন্তার আরেক কারণ এই অবসাদ আত্মহত্যা প্রবণতা ও অপরাধ প্রবণতার রূপ নিয়ে নিচ্ছে।

এর মোকাবিলা আর কারণ নিয়ে এখন সচেতনতা বাড়ানোর জন্যে অনেক রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রথমত ছোটদের মন খারাপ, তাদের আত্মসম্মান, তাদের স্বাভিমানকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বারে বারে মনে করিয়ে দেওয়া হয়। একজন শিশুর পছন্দ-অপছন্দ বড়দের মতোই গুরুত্বপূর্ণ তা বারে বারে আলোচিত হচ্ছে। আবার ছোটদের একাকিত্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। মা-বাবা দু'জনেই কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকায় আর শিশুরাও তাদের সমবয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গ না পেয়ে যে অবস্থার মধ্যে পড়ে তাতে তারা নিজেদের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই গুটিয়ে যায়। তাদের মন খারাপের কিছু ঘটলে তারা সেটা কারোর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মতো পায় না। এক্ষেত্রে হয় খুব সাধারণ বিষয়কে বেশি বড় করে দেখে—সে ভুল শোধরানোরও উপায় থাকে না। আবার যদি তাদের মন খারাপের কারণ সংগত হয় তবে তা থেকে বেরিয়ে আসার মতো সাহায্য তারা পায় না। একটা বয়স অবধি শিশুর মা-বাবা বা বড়দেরই তাকে সাহায্য করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বড়রা ব্যস্ত থাকায় তাদের মধ্যে সে তার বন্ধুকে অনেক সময়েই খুঁজে পায় না। তাই একাকিত্বের শিকার শিশুর নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

ভাবলে অবাক লাগে আমরা তাদের কত অসহায় অবস্থায় ফেলি। তাদের ব্যস্ত রাখতে বা নিজেরা সঙ্গ দিতে না পারায় তাদের হাতে মোবাইল, টিভি ও অন্য অনেক গ্যাজেট তুলে দিই। এতে স্মার্টফোনে গেম খেলা বা নিজে নিজে ভিডিও চালিয়ে দেখা, এখন বছর দুয়েকের বাচ্চার কাছেও জলভাত। ফোন দেখিয়ে কান্না ভোলানো বা খাওয়ানো বাবা-মায়ের কাছে একটা সহজ উপায়। কিন্তু সেই 'সহজ উপায়' যে ভেতরে ভেতরে কত বড় ক্ষতির বীজ বোনে তা যখন তাঁরা বুঝতে পারছেন, তখন অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। টিভি, কম্পিউটার আর ভিডিও গেমস খেলে বাচ্চারা তাদের চারপাশের প্রতি উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। বাস্তব জগৎ নিয়ে উদাসীনতা তাদের মধ্যে এক কাল্পনিক জগৎকে বাস্তব করে তুলছে। তাদের ঠিক যেটুকু প্রয়োজন, তাতে সামান্য ব্যাঘাত ঘটলেই হতাশ হয়ে উঠছে। তারা বুঝতেই শিখছে না কী তাদের অধিকার বা এক্তিয়ার। তাদের বায়না চাহিদা এমনভাবে বাড়ছে যে তা সামাল দেওয়া বাড়ির লোকেদের কাছে সম্ভব হচ্ছে না। একটা সময় পরে শিশুটি নিজের অবসাদ নিজেই তৈরি করছে।

এই সমস্যার কারণ খুঁজে খুঁজে সকলেই হয়রান। তার মোকাবিলাও কিছু সহজ ব্যাপার নয়। বাড়ির লোকের ট্রেনিং ও ছোটদের কাউন্সেলিং দরকারি হয়ে উঠছে। কিন্তু সবথেকে দরকার জীবনশৈলীর একটা বড় পরিবর্তন। যেখানে পরিবার সব সময় শিশুর সঙ্গে বন্ধুর মতো থাকবে। তার মানসিকতার সুস্থ বিকাশের জন্যে তাকে শরীরচর্চা, বন্ধুদের সঙ্গ, বইপড়া, খেলা, সুস্থ বিনোদনের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। যে কোনও গ্যাজেট যাতে শিশুদের আসক্তি না হয়ে ওঠে তা নিয়ে বারে বারে সাবধান করা হচ্ছে। কিছু বিশেষজ্ঞের তো মত যে বাচ্চাদের মধ্যে কল্পনাপ্রবণতা বাড়াতে পারলে তা সুস্থ মানসিকতা তৈরি করে। খুশিমতো ছবি আঁকা, রং নিয়ে খেলা, গান গাওয়া বা নাচা ওষুধের মতোই কাজ করে। ভালো-মন্দ আর উচিত-অনুচিতের বোধ তৈরি করা দরকার। এর থেকে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ বাড়ে। মন বিক্ষিপ্ত না হয়ে বিকশিত হতে থাকে। চারপাশ হাসিখুশি শিশুতেই ভরে থাকবে—যেমনটা আমরা চাই।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৫ এপ্রিল ২০১৭

ক্লাস নাইন-এর টিউশন | ইতিহাস

আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব

পঞ্চাদশ-ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন:

আজ আমরা রাষ্ট্র বলতে যা বুঝি, তা কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠেনি। ইংল্যান্ডেও নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু সে দেশের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের কিছু নিজস্ব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। টিউডর বংশের রাজাগণ ও প্রথম যুগের স্টুয়ার্টগণের আমলে ইংল্যান্ডে স্বৈরতন্ত্র ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে একটি পরিপূর্ণ আকার নিয়েছিল। ইংল্যান্ডের অভিজাতরা সবাই ছিলেন একটি কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রের অধীনস্ত প্রজা। মূলত, এদের প্রতিনিধি নিয়ে গড়ে উঠেছিল ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট। একটি কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক প্রশাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট ছিল প্রশাসনের অন্যতম হাতিয়ার। এটাই ছিল মহাদেশীয় ইউরোপের সঙ্গে ইংল্যান্ডের পরিস্থিতির পার্থক্য। অবশ্য সেখানে প্রজাতন্ত্রের সহায়ক হওয়া সত্ত্বেও পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি নেহাত উপেক্ষণীয় ছিল না। অন্যদিকে রাজাও প্রধানত পার্লামেন্টের মাধ্যমেই দেশ শাসন করতেন। এই সাংবিধানিক প্রথাই 'কিং ইন পার্লামেন্ট' নামে পরিচিত।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বর্তমান কালের মতো ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ছিল দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। এর উচ্চকক্ষ 'হাউস অব লর্ডস' নামে পরিচিত ছিল। আর নিম্নকক্ষটি পরিচিত ছিল 'হাউস অব কমন্স' নামে। উচ্চকক্ষের প্রতিনিধিরা ছিলেন উচ্চ অভিজাত ও যাজক গোষ্ঠীভুক্ত। অন্যদিকে, আইনজীবী ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন যাজক শ্রেণির সদস্যরা ছিলেন 'হাউস অব কমন্স'-এর সদস্য। নিম্নকক্ষের যাজকদের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে 'জেনট্রি' বা উচ্চ বংশজাতদের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি কিছু বেশি ছিল। কারণ, এঁরা ছিলেন জমির মালিক। প্রশাসনের গঠন ও নীতি নির্ধারণে এঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অবশ্য এঁদের পাশাপাশি উচ্চকক্ষের

সদস্য অভিজাতরাও প্রায় সমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব উপভোগ করতেন। এই অভিজাত ও জেন্ট্রি-কে নিয়ে গড়ে উঠেছিল শাসক শ্রেণি। স্থানীয় স্তরের প্রশাসনের ওপর ভদ্রশ্রেণির কর্তৃত্ব ও প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

জেন্ট্রিরা ছিলেন পার্লামেন্টের অপরিহার্য অঙ্গ। ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় যে, সেখানে শাসকশ্রেণি এবং তাদের সহযোগিরা জাতীয় ঐক্যের অভিন্ন স্বার্থের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করত। এদের স্থানীয় বা সংকীর্ণ অর্থে শ্রেণিগত স্বার্থ ও সংঘাত থাকলেও তা কখনও জাতীয় স্বার্থকে অতিক্রম করেনি। আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত অর্থনৈতিক স্বার্থের তুলনায় জাতীয় স্বার্থকেই সবসময় অগ্রাধিকার দেওয়া হত। শাসকশ্রেণির এ ধরনের এক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টম হেনরি ও প্রথম এলিজাবেথ একটি সুষ্ঠ ও কার্যকরী রাজকীয় প্রশাসন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটাই ছিল তাঁদের স্বৈরতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি।

এদিকে সপ্তদশ শতকে ফরাসি প্রশাসনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার পরাজয় ও রাষ্ট্রীয় চূড়ান্তবাদের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু রাতারাতি চূড়ান্তবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফরাসি রেনেসাঁর ফলে রাজতন্ত্রে মূলত দু'টি সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং অন্যটি স্বাধীনতাকে খর্ব করেছিল।

ফরাসি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের তিনটি স্তর লক্ষ করা যায়—

১) বিচারবিভাগীয় রাজতন্ত্র,

২)আইনসভাভিত্তিক রাজতন্ত্র এবং

৩) প্রশাসনিক রাজতন্ত্র।

পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্বে ফ্রান্সে বিচারবিভাগীয় রাজতন্ত্রের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। আইনসভাভিত্তিক রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে। আর প্রশাসনিক রাজতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বুরবোঁ রাজবংশের সময়। অত্যধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বুরবোঁ রাজারা ফরাসি প্রজার প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পর্বে হস্তক্ষেপ করতেন। প্রতিটি নাগরিক ও অনাগরিকের দৈনন্দিন অস্তিত্বের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল রাষ্ট্র। তখন রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল আগের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়, পরাক্রমশালী ও কেন্দ্রীভূত।

আলোচ্য পর্বে ফরাসি রাজতন্ত্রকে দু'টি পরস্পর বিরোধী সমাজব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং এদের পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার কাজটা ছিল জটিল। ফরাসি সমাজ একদিকে গতানুগতিক সামাজিক ও আইনগত শ্রেণি বিভাজনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে এই ব্যবস্থা ছিল আর্থিক ক্রিয়াকলাপ ও সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। গতানুগতিক সামাজিক ও আইনগত শ্রেণি বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিশেষ অধিকারভোগী ও বনেদি অভিজাত শ্রেণি। এই ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল অসাম্য। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল সমানাধিকার। আইনের চোখে নারী ছাড়া প্রত্যেক ফরাসি নাগরিক ছিলেন সমান। কিন্তু বাস্তবে তা ছিল না। এক শ্রেণি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বিশেষ অধিকার এবং সুবিধা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইত। অন্য শ্রেণি ছিল এর বিরোধী।

ক্লাস নাইন-এর টিউশন | ভূগোল

ভূমিরূপ গঠন

আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া বা ভূমিরূপ গঠন প্রক্রিয়া। ভূমিরূপ গঠন প্রক্রিয়া বা geomorphology। গ্রিক শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। (ge=earth, morfe=form, logos=study) । পৃথিবীর প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সমভূমি, মালভূমি, পাহাড়-পর্বত। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষয় হতে হতে এরা ভূমিরূপ গঠন করে। পৃথিবীপৃষ্ঠের এই ভূমিরূপ গঠনে ভূ-অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক— এই দুই প্রকার প্রক্রিয়া কাজ করে।

আমাদের জানার দরকার, ভূ-অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রক্রিয়াগুলি কী কী? ভূ-অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার প্রধান কারণ ভূ-গাঠনিক উত্থান-পতন। এদের মধ্যে পর্বত শ্রেণির উত্থান, অগ্ন্যুৎপাত, সমস্থিতিমূলক ভূমির উত্থান-পতন বা অবনমন প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। বাহ্যিক প্রক্রিয়া বলতে জল, বায়ু, তুষার, বরফ, জীবজগৎ প্রভৃতির কথা বলা যায়।

ভূমিরূপ গঠন প্রক্রিয়া কাকে বলে?

ভূমিরূপ সৃষ্টির প্রধান কারণ হল, প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি যে ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটায় তাকেই ভূমিরূপ গঠন প্রক্রিয়া বলে। এই প্রক্রিয়া দু'রকম— ১) পার্থিব বা জাগতিক প্রক্রিয়া (terrestrial processes) ২) অপার্থিব বা মহাজাগতিক প্রক্রিয়া (extra-terrestrial processes)।

পার্থিব প্রক্রিয়া: ভূপৃষ্ঠে সক্রিয়ভাবে যে শক্তিগুলি ভূমিরূপ গঠন করে তাকে পার্থিব প্রক্রিয়া বলে। পার্থিব প্রক্রিয়াকে দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১) অন্তঃস্থ বা অন্তর্জাত প্রক্রিয়াসমূহ

(internal processes) এবং ২) বহিঃস্থ বা বহির্জাত প্রক্রিয়াসমূহ (external processes)।

অন্তঃস্থ বা অন্তর্জাত প্রক্রিয়াসমূহ: পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে অন্তঃস্থ প্রক্রিয়া কাজ করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অভ্যন্তর ভাগে নানান তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে। এই পদার্থ ক্রমাগত তাপ শক্তি উৎপাদন করে। এই তাপশক্তির প্রভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে অন্তঃস্থ শক্তি সক্রিয়তা লাভ করে। এই শক্তি ধীরে ধীরে বা হঠাৎ ভূমিরূপের পরিবর্তন করে। পৃথিবীর অন্তঃস্থ প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে বা আকস্মিক ভাবে কাজ করায় ভূপৃষ্ঠ উত্থিত, পতিত, বা নতুন ভাবে গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফল হল ভূ-বিপর্যয় বা ভূ-গাঠনিক তত্ত্ব। হাজার হাজার বছর ধরে ভূ-গাঠনিক আলোড়নের ফলে ভূমিরূপের পুনর্গঠন হয়।

ভূমিরূপের আলোড়ন দুই প্রকার। মহীভাবক আলোড়ন ও গিরিজনি আলোড়ন। এবার আমাদের জানতে হবে, মহীভাবক আলোড়ন কাকে বলে? ১৮৯০ সালে জি কে গিলবার্ট এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। গ্রিক শব্দ eperios যার ইংরেজি অর্থ mainland। genesis যার অর্থ জন্ম। সুতরাং, এই কথা বলা যায় মহীভাবক আলোড়নে মহাদেশ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এই আলোড়নের ফলে ভূপৃষ্ঠের কোনও অংশ উপরে উঠে গেলে, পাশের অংশ নীচে নেমে যায়। এর ফলে সমুদ্রতটের কিছু অংশ উপরে উঠে এসে মহাদেশ গঠন করে। আবার মহাদেশের কিছু অংশ বসে গিয়ে সমুদ্রের সৃষ্টি করে। এই আলোড়নে উত্থান-পতন এই দুই কাজ একইসঙ্গে ঘটে। মহাদেশীয় বা মহীভাবক আলোড়নের ফলে একদিকে মহাদেশ, সমুদ্রতল, মালভূমি ইত্যাদি যেমন তৈরি হয়। অন্যদিকে চ্যুতি, গ্রস্ত উপত্যকা, স্তূপ, পর্বত সৃষ্টি হয়।

এই গেল মহীভাবক আলোড়নের কথা। এবার জানব গিরিজনি আলোড়ন। এই রকম আলোড়নের ফলে ভূপৃষ্ঠে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয়। গ্রিক শব্দ ওরস যার অর্থ পর্বত, ও genesis যার অর্থ জন্ম। এই প্রকার আলোড়ন ভূপৃষ্ঠে অনুভূমিক ভাবে বা পৃথিবীর স্পর্শক বরাবর কাজ করে। ফলে ভূপৃষ্ঠের কোথাও সংনমনের প্রভাবে শিলায় সংকোচন আবার কোথাও টানের প্রভাবে সম্প্রসারণের সৃষ্টি হয়। কার্যত বিশাল অঞ্চল জুড়ে পাললিক শিলার ওপর পোষণ দ্বারা ভাঁজ সৃষ্টি করে ও তাকে ধীরে ধীরে ওপরের দিকে তোলার চেষ্টা করে। এর ফলেই ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয়। গিরিজনি আলোড়নের প্রভাবে আল্পস, হিমালয়, আন্দিজ ইত্যাদি পর্বতের সৃষ্টি। এছাড়াও ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদিও ভূমিরূপ গঠনে কার্যকরী ভূমিকা নেয়।

বহিঃস্থ বা বহির্জাত প্রক্রিয়াসমূহ: ভূমিরূপ গঠনে যে সকল প্রক্রিয়া ভূত্বকের উপরিভাগে কাজ করে তাদের ভূমিরূপ গঠনের বহিঃস্থ বা বহির্জাত প্রক্রিয়া বলে। যেমন— নদী, বায়ু, হিমাবহ, সমুদ্রতরঙ্গ, ভৌমজল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই প্রক্রিয়া দু'ভাবে কাজ করে। অবরোহণ ও আরোহণ প্রক্রিয়া। অবরোহণ প্রক্রিয়ার প্রধান শক্তিগুলি হল, আবহবিকার, ক্ষয়ীভবন ও পুঞ্জিত ক্ষয়। আবার অপরদিকে আরোহণ প্রক্রিয়ার শক্তি হল নদী, বায়ু, হিমবাহ ইত্যাদি।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভূমিরূপ— ভূমিরূপকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। পর্বত, মালভূমি, সমভূমি। এবার বলো তো পর্বত কাকে বলে? বহুদূর বিস্তৃত কমপক্ষে ১০০০ মিটার উঁচু একাধিক শৃঙ্গ যুক্ত ভূপ্রকৃতিকে পর্বত বলে। সিমলা, দার্জিলিং, নৈনিতাল গেলে দেখা যায় বহুদূর বিস্তৃত সুবিশাল উচ্চ ভূমিরূপ। পর্বত বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হয়। সাধারণত ভূ-অভ্যন্তরীণ তাপ ও চাপে ভূপৃষ্ঠ কুঁচকে পর্বতের সৃষ্টি হয়। পর্বতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সেগুলি হল— ১) পর্বত সাধারণত খাড়া ঢালু হয়। ২) পর্বতের একাধিক সূচালো চুড়ো থাকে। ৩) অনেক সময় চুড়োগুলি বরফাবৃত থাকে এবং ৪) পর্বত একাধিক শ্রেণিমালার মতো থাকে বলে একাধিক গিরিখাত, উপত্যকা দেখা যায়।

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

প্রথম পাতার পর

পড়ানোর সময় শিক্ষকরা কীভাবে কী কী বলে বুঝিয়েছিলেন তা মনে পড়বে এবং পড়া বুঝতে ও মনে রাখতে সুবিধা হবে। আসলে পড়াশোনাটা এনজয় করতে হয়। বাড়ির মানুষ বকাবকি করবেন তারপর বই নিয়ে বসবে। এমনটা হলে চলবে না। বাধ্য হয়ে নয়, নিজের ইচ্ছায় পড়তে বসতে হবে। পড়াশোনাকে ভালোবাসতে হবে। খুব মন দিয়ে পড়তে হবে। পড়তে বসার আগে প্ল্যান করে বসতে হবে। আজ কী কী পড়বে তার একটা ছক মাথায় এঁকে নিতে হবে। আর পড়তে বসে বার বার উঠে যাবে না। এতে মনোসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। আমি বলছি না, সারাক্ষণ পড়াই বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ পড়বে খুব মন দিয়ে পড়বে। তাহলেই যথেষ্ট।

পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে একজন ভালো মানুষ হয়ে উঠতে হবে। শুধু পড়াশোনা করলে আর বড়দের সম্মান, ছোটদের ভালোবাসলে না, এমন পড়াশোনার কোনও দাম নেই। সমাজ এবং দেশের উন্নতির প্রতি তাদের দায়িত্বজ্ঞান থাকতে হবে। মনে রাখবে, শুধু পুথিগত বিদ্যায় ভালো মানুষ হওয়া যায় না। একজন আদর্শ হয়ে উঠতে হলে সবার আগে ভালো মানুষ হও। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। তাদের আশীর্বাদও আমাদের সাফল্যের নেপথ্যে একটা ভূমিকা পালন করে। তোমাদের সবার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। তোমরা সফল হও, এগিয়ে যাও।

উত্তরণ

যুগশঙ্খ SUPPLI

মঙ্গলবার, ২৫ এপ্রিল ২০১৭

তোমাদের প্রিয় ‘উত্তরণ’-এ **‘আমি ও আমার স্কুল’** বিভাগের জন্য তোমরা তোমাদের স্কুল সম্পর্কে লিখে জানাও, লিখে জানাও স্কুলের টিচাররা পড়াশোনায় তোমাদের কীভাবে সাহায্য করেন। সঙ্গে পাঠিও তোমার ও তোমার স্কুলের ছবি।

খাতায় লিখে বাড়ির বড়দের বলবে ইউনিকোড হরফে (যেমন অভ্র) টাইপ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল (.doc) মেল করে দিতে বলো। মেল করার সময় মেল-সাবজেক্ট লিখে দিতে বোলো ‘CONTENT FOR AAMI O AAMAR SCHOOL’

মেল আইডি:
jugasankha.suppli@gmail.com

মেল করার ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে নীচের নম্বরে ফোন করতে পারো: **শর্মিলাদি** (কলকাতা ও শিলিগুড়ি সংস্করণ)
9231914537 এবং
বিদিশদি (শিলচর, গুয়াহাটি ও ডিব্রুগড় সংস্করণ)
8486581362

ক্লাস টেন-এর টিউশন | ইতিহাস

১৯ শতকের বাংলার শিক্ষা সংস্কার

আজ আমরা আলোচনা করব, উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষা-সংস্কার নিয়ে। অষ্টাদশ শতকে অর্থাৎ মোঘল সাম্রাজ্যের শেষের দিকে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়ে। এর কারণ ছিল, আর্থিক দুরাবস্থা ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও রকম হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেছিল। কারণ,তাদের ধারণা ছিল যে, ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করলে ভারতবাসীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে। গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আগে পর্যন্ত ইংরেজ শাসকরা দেশি ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা প্রসারের সমর্থক ছিলেন। এ বিষয়ে অগ্রণী হন ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতার গণ্যমান্য মুসলিম নাগরিকদের অনুরোধে মুসলিম শিক্ষা ও চর্চার মান উন্নয়নের জন্য ‘কলকাতা মাদ্রাসা’র প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বারাণসীর ইংরেজ প্রেসিডেন্ট জোনাথন ডানকান সেখানে একটি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোনস প্রাচ্যের ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চার জন্য কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন এবং কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ইংরেজদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনের খাতিরে ইংরেজ শাসকরা প্রথমদিকে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য চর্চার দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলির উদ্যোগে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ভারতে ব্রিটিশ কর্মচারীদের প্রাচ্য ভাষা, সাহিত্য ও রীতিনীতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়,তাদের মধ্যেই পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করার প্রবণতা দেখা দেয়। এছাড়া ইংরেজ সরকার ও ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়।

বাঙালিরাই সকলের আগে ইংরেজি শেখার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। এ ব্যাপারে তারা খ্রিস্টান মিশনারি বা ধর্মপ্রচারক ও ইংরেজ মানবতাবাদীদের সাহায্য পায়। ইংল্যান্ডে এই মিশনারি ‘ক্ল্যাপহাম গোষ্ঠী’ নামে পরিচিত ছিল। চার্লস গ্রান্ট, উইলবার ফোর্স প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় কোম্পানি অধিকৃত অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ওপর থেকে নিষধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

ইংরেজি ভাষা প্রচারের ব্যাপারে অগ্রণী হয় ইউরেশীয়রা। শেরবোন নামে এক ইউরেশিয়ান কলকাতার জোড়াসাঁকোয় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়েই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজি অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের অবদানও কম ছিল না। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা বাঙালিকে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখাবার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে উইলিয়াম কেরির নাম সকলের আগে করা যায়। তিনি মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড নামে দুই ধর্মপ্রচারকের সাহায্যে শ্রীরামপুরে একটি ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে ডেভিড হেয়ার-এর নামও উল্লেখ করা যায়। তিনি কলকাতায় একটি ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় যা ‘হেয়ার স্কুল’ নামে পরিচিত ও ‘স্কুল বুক সোসাইটি’র প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর রেভারেন্ড ডাফ নামে এক স্কচ ধর্মপ্রচারক ও রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হন।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে যে সনদ দেওয়া হয়, তাতে বলা হয়, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তোলার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার অভিপ্রেত ছিল, এই টাকায় স্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া। ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের কোনও পরিকল্পনা সরকারের ছিল না। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রথম সুপারিশ করেন চার্লস গ্রান্ট ও উইলিয়াম ফোর্স। বেন্টিঙ্ক ও শিক্ষা সচিব টমাস ব্যাবিংটন এডওয়ার্ড মেকলে ‘জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনে’র সভাপতি হয়ে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নেন। বেন্টিঙ্ক পাশ্চাত্য শিক্ষার ‘চুঁইয়ে পড়া নীতি’তে বিশ্বাসী ছিলেন। বেন্টিঙ্ক, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি হাইস্কুল, থমাসন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বোম্বের এলফিন স্টোন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতে উচ্চশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে স্যার চার্লস উডের সুপারিশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। তাঁর সুপারিশ হল, কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা, একটি শিক্ষা বিভাগ গঠন, শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সরকারি স্কুল ও কলেজগুলির সংস্কার সাধন করা, বেসরকারি স্কুলে সরকারি অনুদান প্রথা চালু করা প্রভৃতি।

কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে।
বাংলা ছাপা অক্ষর তৈরির পর প্রথম ছাপা বই ‘হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ’।
বেনারস সংস্কৃত কলেজ তৈরি করেন জোনাথন ডাক।
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের শেষ হয় ‘অকল্যান্ড মিনিটে’র দ্বারা।
অকল্যান্ড মিনিট একটি শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদন।
ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।

ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারী শিক্ষারও প্রসার ঘটে। রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার, বিদ্যাসাগর প্রমুখের এ বিষয়ে উদ্যোগ ছিল। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি গঠন করে নারীশিক্ষায় উৎসাহ বাড়াতে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের ‘স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক’ বইটি প্রকাশ করা হয়। বিদ্যাসাগর জন ইলিয়ট ড্রিংক ওয়াটার বেথুনের সহযোগিতায় বেথুন স্কুল ও কলেজ তৈরি করেন। বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার জন্য মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেন।

ক্লাস টেন-এর টিউশন | ভূগোল

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

এর আগে আমরা আলোচনা করেছি ভূমিরূপ গঠনে পার্থিব প্রক্রিয়ার অন্তর্গত প্রক্রিয়া নিয়ে। আজ আমরা আলোচনা করব গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনার বদ্বীপের সক্রিয় অংশের (সুন্দরবন) ওপর পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। ভারতের উত্তর-পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থান করছে গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনার বদ্বীপের সক্রিয় অংশ তথা পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন। ভারত ও বাংলাদেশের অন্তর্গত প্রায় ৯,৬৩০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই সুন্দরবনের ৬,০০০ কিমি এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে ভারত ও বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য ম্যানগ্রোভ অরণ্যভূমি। এই সুন্দরবনের ৪,৪৯৩ বর্গকিমি স্থান জনবসতির ৫,১৩৭ বর্গকিমি সংরক্ষিত বনভূমি যার ২,৫৮৫ বর্গকিমি অঞ্চল ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত। এখানে গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা নদীর পলি বিধৌত মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২টি। যার মধ্যে ৫৪টি বসতিযুক্ত ও ৪৮টি বসতিহীন ও বনভূমি দ্বারা আবৃত। জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী জৈব বৈচিত্র্যে ভরপুর এই সুন্দরবনে মোট ১,৫৮৬টি প্রজাতির প্রাণী আছে। ১৯৮৭ সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বলে ঘোষণা করেছে। ১৯৮৯ সালে ভারত সরকার সুন্দরবনকে ‘সংরক্ষিত বনভূমি’ ঘোষণা করে।

এবার আমরা আলোচনা করব, কীভাবে পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রভাবিত হচ্ছে সুন্দরবনের জলবায়ু। উপকূল বরাবর সুন্দরবনের গঠন প্রকৃতি মূলত বহুমাত্রিক উপাদানসমূহ দ্বারা প্রভাবিত। এর মধ্যে রয়েছে স্রোতের গতি ও সমুদ্র উপকূলবর্তী দীর্ঘ সমুদ্রতটের স্রোত। বিভিন্ন মরসুমে সমুদ্রতটের স্রোত যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তনশীল। এই স্রোত আবার কখনও কখনও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবেও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এই সব কারণে যে ক্ষয় ও সঞ্চয় হয়, তা ভূপ্রকৃতির পরিবর্তনে মাত্রাগত পার্থক্য তৈরি করে। আবার বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সুন্দরবন অঞ্চলে সমুদ্র জলপৃষ্ঠের উষ্ণতা প্রতি দশকে ০.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হারে বাড়ছে। সমুদ্র জলপৃষ্ঠের ক্রমশ উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সুন্দরবনের জলজ বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন। যদিও ম্যানগ্রোভ বন নিজেই স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেক মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ঋতুতে বঙ্গীয় বদ্বীপের পুরোটিই জলে ডুবে যায়। এর অধিকাংশই ডুবে থাকে বছরের প্রায় অর্ধেক সময় জুড়ে। অববাহিকার নিম্নাঞ্চলের পলি প্রাথমিকভাবে আসে মৌসুমি বৃষ্টিপাতের সময় সমুদ্রের চরিত্র ও ঘূর্ণিঝড়ের ফলে। আগামী বছরগুলোতে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি। জানা গেছে, উঁচু অঞ্চলে মিষ্টি জলের গতিপথ বদলে যাওয়ার কারণে ভারতীয় ম্যানগ্রোভ আর্দ্রভূমিগুলোর অনেকগুলিতে মিষ্টি জলের প্রবাহ বিশেষভাবে কমে গেছে। পাশাপাশি, নিও-টেকটনিক গতির কারণে বেঙ্গল বেসিনও পূর্বের দিকে সামান্য ঢালু হয়ে গেছে। এর ফলে মিষ্টি জলের বড় একটা অংশ চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবনে। এই কারণের জন্যই বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবনে নোনা জলের পরিমাণ তুলনায় অনেকটাই কম।

এছাড়াও রয়েছে ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব। ১৯৪৩ সাল থেকে শুরু করে ২০১০ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ব্যাপক হারে বেড়েছে। ২০০৯ সালে আয়লা নামক ক্রান্তীয় ঘূর্ণাবর্তে সুন্দরবনে যে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়, তার ফলে নদী জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি ও বন্যা ভয়ংকর রূপ ধারণ করলে বহু দ্বীপ বা ভূমি সমুদ্রজলে নিমজ্জিত হয়। এর ফলে এই অঞ্চলের ব্যাপক সংখ্যক উদ্ভিদ, প্রাণী ও জনবসতি ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এর পাশাপাশি রয়েছে অতিরিক্ত মৌসুমি বৃষ্টিপাতের প্রভাব। পৃথিবীব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে মৌসুমি বৃষ্টিপাত অনিয়মিত ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এর ফলে কোনও বছর স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলেই এই অঞ্চলের নদী-নালা, খাল-বিল, খাঁড়ি প্রভৃতিতে প্রচণ্ড জলস্ফীতি ও বন্যার কারণে প্রচুর ক্ষতি হয়।

এবার আমরা আলোচনা করব হিমবাহ নিয়ে। প্রথমেই জানতে হবে হিমবাহ কাকে বলে। হিমবাহ বলতে বোঝায় বরফের বিরাট চলমান স্তূপকে। সাধারণত পার্বত্য অঞ্চলে শীতকালে তুষার পড়ার হার গ্রীষ্মে গলনের হারের চেয়ে বেশি হলে পাহাড়ের উপরে ধীরে ধীরে তুষার জমতে শুরু করে। এই তুষার জমে শক্ত বরফে পরিণত হয়। এই বরফজমা এলাকাটিকে আইসফিল্ড বলে। যখন এই জমা বরফ নিজের ওজনের ভারে ও মাধ্যাকর্ষণের টানে ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নামতে শুরু করে তখন তাকে হিমবাহ বলে। তবে এই জমা বরফ এতটাই পুরু হয় ও এর গতি এতই কম হয় যে একে স্থির বলে মনে হয়।

তরঙ্গ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৫ এপ্রিল ২০১৭

স্পেশাল টিউশন | কম্পিউটার

মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট

Header & Footer-এর ব্যবহার

স্লাইডে পেজ নম্বর, অথর নেম, তারিখ ইত্যাদি বিষয়গুলো পাওয়ার পয়েন্টে Header & Footer থেকে নিতে হয়। যে কোনও অফিশিয়াল ডকুমেন্ট বা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের স্লাইডে হেডার ও ফুটার ব্যবহার সেই ডকুমেন্ট বা প্রেজেন্টেশনকে প্রফেশনাল রূপদান করে। তাই আপনার প্রেজেন্টেশনকে প্রোফেশনাল করতে বা প্রেজেন্টেশনের মান বাড়াতে স্লাইডে হেডার ও ফুটারের ব্যবহার জানা প্রয়োজন। আমরা আগে কম্পিউটার শিক্ষায় MS Excel ও MS Word-এ হেডার ও ফুটার কীভাবে নিতে হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আজ আমরা আলোচনা করবো কীভাবে Power Point-এ হেডার ও ফুটার নিতে হয়।

স্লাইডে হেডার ও ফুটার নেওয়ার জন্য প্রথমে যে স্লাইডে হেডার ও ফুটার নেবেন সেই স্লাইডটি সিলেক্ট করুন। তারপর রিবনের Insert ট্যাব থেকে Text গ্রুপের Header & Footer-এ ক্লিক করুন তাহলে Header and Footer নামের একটি ডায়ালগ বক্স আসবে।

স্লাইডে হেডার ও ফুটার নেওয়ার জন্য এই ডায়ালগ বক্সটির সঠিক ব্যবহার জানা প্রয়োজন। তাহলেই আপনি স্লাইডে হেডার ও ফুটার নিতে পারবেন। স্লাইডে হেডার ও ফুটার নেওয়ার জন্য ডায়ালগ বক্সে লক্ষ করুন, এখানে দু'টি ট্যাব রয়েছে Slide এবং Notes and Handouts. এখন আমরা Slide ট্যাবে অপশনগুলো সম্পর্কে জানব। সেক্ষেত্রে Slide ট্যাবের Include on Slide-এ বেস কিছু অপশন রয়েছে যেমন: Time and Date, Update automatically, Language, Calendar, Fixed, Slide Number, Footer, Don't show on title slide, Apply to all, Apply, Cancel ও Preview. এখন অপশনগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেই কীভাবে Power Point-এ হেডার ও ফুটার নিতে হয় তা বুঝে যাবেন। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে সেটি হল, স্লাইডে ফুটার ব্যবহার করার জন্য Header and Footer ডায়ালগ বক্সের Slide ট্যাবের অপশনগুলোতে কাজ করতে হবে এবং হেডারের জন্য Notes and Handouts ট্যাবের অপশনগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে।

Time and Date: আপনি যদি স্লাইডে ফুটার অংশে সময় ও তারিখ ব্যবহার করতে চান তাহলে ডায়ালগ বক্সের Time and Date-এর ঘরটিতে ক্লিক করলে Time and Date ব্যবহার করার জন্য Update automatically, Language, Fixed এই অপশনগুলো সব অ্যাকটিভ হয়ে যাবে।

Update automatically: ফুটার অংশে টাইম ও ডেট নেওয়ার পর সেটি অটোমেটিক আপডেট দেখাবে এবং তারিখ ও সময়ের লেখাগুলোর ধরন কেমন হয় সেটি সিলেক্ট করতে Update automatically-এর নীচের ঘরটিতে ক্লিক করুন। দেখবেন একটি সময় ও তারিখের চার্ট আসবে, সেখান থেকে আপনার পছন্দমতো লেখার ধরনটি বাছাই করে তাতে ক্লিক করুন। তাহলে স্লাইডে সেই ধরনের লেখা অনুযায়ী সময় বা তারিখ ব্যবহার হবে।

Language: এই অপশনটি ব্যবহার করে সময় ও তারিখ ব্যবহারের জন্য ভাষার পরিবর্তন করতে পারবেন।

Fixed: যদি সময় ও তারিখ রেগুলার আপডেট না করে যে কোনও একটি সময় ও তারিখ নির্ধারণ করতে চান তাহলে Fixed ঘরে ক্লিক করে সেটি অ্যাকটিভ করুন।

Slide Number: যদি স্লাইডের ফুটার অংশে নাম্বার দিতে চান তাহলে এই ঘরটিতে ক্লিক করে অপশনটি সচল করুন।

Footer: স্লাইডে ফুটারের তিনটি অংশ ব্যবহার করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে যদি তারিখ ব্যবহার করে তাহলে সেটি ফুটারের বাঁপাশে থাকবে আর যদি তারিখের সঙ্গে নাম্বার ব্যবহার করেন তাহলে সেটি ফুটারের ডানপাশে থাকবে। আর যদি ফুটারের মাঝখানে কিছু লিখতে চান তাহলে Footer-এর ঘরটিতে ক্লিক করে ফুটার অংশটি সচল করুন। তারপর Footer-এর নীচের ঘরটিতে কারসর পয়েন্টার সচল থাকবে এবং সেখানে যা লিখবেন সেটি ফুটারের মাঝখানে ব্যবহার হবে। Don't show on title slide: যদি সবগুলো স্লাইডে ফুটার ব্যবহার করতে চান শুধু মাত্র সেই স্লাইডটি বাদে যেটিতে টাইটেল ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম স্লাইড বাদে সবগুলো স্লাইডে ফুটার ব্যবহার হবে এই অপশনটি সচল করলে।

Apply to all: এই অপশনটি ব্যবহার করলে সবগুলো স্লাইডে ফুটার ব্যবহার হবে। যদি Don't show on title slide অপশনটিও সচল করা থাকে তাহলে প্রথম স্লাইড বাদে সবগুলো স্লাইডে ফুটার ব্যবহার হবে।

Apply: এই অপশনটি ব্যবহার করলে শুধু মাত্র যে স্লাইডটি সিলেক্ট করা হয়েছে সেই স্লাইডটিতে ফুটার ব্যবহার হবে।

Cancel ও Preview: Cancel অপশনটি অর্থ আমরা সবাই জানি, যদি স্লাইডে হেডার ও ফুটার ব্যবহার করতে না চান তবে এবং ডায়ালগ বক্সটি ক্লোজ করতে এই অপশনটি ব্যবহার কতে হয়। আর Preview অপশনটিতে আপনি হেডার ও ফুটারের কোন অংশ ব্যবহার করছেন সেটি এই অপশনে দেখা যাবে।

স্পেশাল টিউশন | ইংলিশ গ্রামার

Number

Number বলতে সাধারণ অর্থে সংখ্যাকে বোঝায়। Grammar-এর ভাষায়, যা দ্বারা কোনও গণনাবাচক noun বা pronoun-এর একমাত্রিক বা বহুমাত্রিক অবস্থাকে বোঝানো হয় তাকে Number বা বচন বলে।

Types of Number: Number সাধারণত দুই প্রকার। যথা—Singular number and Plural number

Singular Number: যা দ্বারা কোনও গণনাবাচক noun বা pronoun-এর একক মাত্রাকে বোঝায় তাকে Singular number বা একবচন বলে।

Example: Book, Brother, Cow, Tree etc.

Plural number: যা দ্বারা কোনও গণনাবাচক noun বা pronoun-এর বহুমাত্রিক অবস্থাকে বোঝায় তাকে Plural number বা বহুবচন বলে।

Example: Books, Brothers, Cows, Trees etc.

Singular number কে Plural Number-এ পরিবর্তন করার নিয়ম: সাধারণত Singular Noun-এর শেষে s' যোগ করে Plural করতে হয়।

Cow—Cows, Boy—Boys, Girl—Girls, Cat—Cats, Desk—Desks, Hand—Hands, Eye—Eyes, Tiger—Tigers, House—Houses

Singular Noun-এর শেষে s, ss, sh, x, বা z থাকলে এবং শেষের ch এর উচ্চারণ 'চ' এর মতো হলে ওইসব Noun-এর শেষে es যোগ করে Plural করতে হয়। যেমন: Bus—Buses, Class—Classes, Brush—Brushes, Bush—Bushes, Box—Boxes, Match—Matches Inch—Inches, Watch—Watches

Singular Noun-এর শেষের 'ch'-এর উচ্চারণ 'চ'-এর মতো না হয়ে 'ক' এর মতো হলে 'es' যোগ না হয়ে শুধু 's' যোগ হয়ে Plural হবে। যেমন—

Stomach—Stomachs, Patriarch—Patriarchs, Monarch—Monarchs

Singular Noun-এর শেষ বর্ণটি 'o' হলে এবং তার পূর্বের বর্ণটি consonant হলে ওই noun-এর শেষে 'es' যোগ করে plural করতে হয়। যেমন

Mango—Mangoes, Potato—Potatoes, Hero—Heroes, Negro—Negroes, Cargo—Cargoes, Volcano—Volcanoes, Buffalo—Buffaloes

কিন্তু কিছু noun-এর শেষে 'o' এবং 'o'-এর পূর্বে consonant থাকা সত্ত্বেও সেগুলোর শেষে 's' যোগ করে plural করতে হয়।

Photo—Photos, Solo—Solos, Piano—Pianos, Canto—Cantos

Singular Noun-এর শেষে 'o' এবং 'o'-এর পূর্বে vowel থাকলে শুধু 's' যোগ করে plural করতে হয়।

Radio—Radios, Cuckoo—Cuckoos, Stereo—Stereos, Bamboo—Bamboos, Studio—Studios

Singular Noun এর শেষের বর্ণ y' এবং y' এর পূর্বে consonant থাকলে y' এর পরিবর্তে ies যুক্ত করে plural করতে হয়।

City—Cities, Baby—Babies, Army—Armies, Body—Bodies, Hobby—Hobbies, Lady—Ladies

কিন্তু y-এর পূর্বে vowel হলে সেক্ষেত্রে singular noun এর শেষে শুধু 's' যোগ করে plural করতে হয়।

Key—Keys, Donkey—Donkeys, Monkey—Monkeys, Boy—Boys, Toy—Toys, Day—Days

f, fe, ef যুক্ত singular noun এর শেষে f, fe, ef উঠিয়ে ves বসিয়ে plural করতে হয়।

Calf—Calves, Leaf—Leaves, Wife—Wives, Thief—Thieves, Life—Lives

শেষে ief, oof, iff, if, eef, arf রয়েছে এ ধরনের বিশেষ কয়েকটি শব্দের শেষে শুধু 's' যোগ করে plural করতে হয়।

Roof—Roofs, Hoof—Hoofs, Safe—Safes, Dwarf—Dwarfs, Cliff—Cliffs, Reef—Reefs

কতগুলো singular noun-এর মাঝের এক বা একাধিক vowel বা consonant পরিবর্তন করে plural করতে হয়।

Man—Men, Woman—Women, Mouse—Mice, Foot—Feet, Tooth—Teeth

কতগুলো noun-এর শেষে en, ren বা ne যোগ করে plural করতে হয়। যেমন: Ox—Oxen, Brother—Brethren, Child—Children

Compound nounগুলোর মূল nounটির শেষে 's' যোগ করে কিংবা মাঝের vowel পরিবর্তন করে plural করতে হয়।

Brother-in-law—Brothers-in-law, Son-in-law—Sons in law, Washerman—Washermen, Passer by—Passers by, Step son—Step sons, Maid Servant—Maid Servants

Hyphen(-) বিহীন compound noun-গুলোকে 's' যোগে plural করতে হয়।

Handful—Handfuls, Bookcase—Bookcases, Spoonful—Spoonfuls, Armchair—Armchairs

কতগুলো compound noun-গুলোকে s যোগে plural করতে হয়।

Man Servant—Men Servants, Lord Justice—Lords Justices, Woman Servant—Women Servants, Knight Templar—Knights Templars

কতগুলো compound noun-এর শেষের nounটির সাথে 's' যোগ করে plural করতে হয়।

Bookcase—Bookcases, Inspector General—Inspector Generals, Showcase—Showcases, Armchair—Armchairs

কিছু noun-এর singular ও plural একই হয়ে থাকে

Sheep—Sheep, Pair—Pair, Swine—Swine, Deer—Deer, Dozen—Dozen, Gross—Gross

কিছু collective noun-এর গঠন singular-এর মতো হলেও এগুলো plural হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

যেমন: poultry, people, cattle, gentry, public, vermin, majority, mankind.

কিছু common noun-এর গঠন singular-এর মতো হলেও এগুলো plural হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

যেমন: the rich, the poor, the virtuous, the pious.

—The rich are not always happy. (Rich is not হয়নি)

—The virtuous are blessed.

কিছু noun plural-এর মতো হলেও এগুলো মূলত singular হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এদের পরে verb-এর singular form ব্যবহার হয়।

যেমন: physics, mathematics, politics, economics, wages, athletics, news, optics, statistics.

—Mathematics is hard subject to me.

—This news is is important.

কিছু noun সর্বদা singular হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

যেমন: Furniture, alphabet, brick, business, hair, information, scenery, machinery, beard, issue, poetry, progress, money, abuse, expenditure, baggage.

—Her hair is very black.

—Money is not a matter.

কিছু noun সর্বদা plural হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এদের কোনও singular হয় না। যেমন— রোগের নাম: Measels(হাম), Mumps(গাল-গলা ফোলা), খেলার নাম: Billiards, Draughts. পোশাকের নাম: trousers, drawers

একই রূপ বিশিষ্ট/জোড়া— spectacles, scissors.

বর্ণ, সংখ্যা বা প্রতীককে plural করতে এপসট্রফি (') ব্যবহার করতে হয়।

—There are five M.A's in our village.

—Add four 3's and five 2's.

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৫ এপ্রিল ২০১৭

উত্তরণ ক্যুইজ

১) ভারতের কোথায় ভারী জল তৈরি করা হয়?
২) সরলতম হাইড্রোকার্বনের নাম কী?
৩) ক্লোরিন গ্যাসের গন্ধ কেমন?
৪) কোন গ্যাসকে অক্সিজেনের বাহক বলা হয়?
৫) ধূমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিডের রং কী?
৬) নাইট্রিক অ্যাসিডকে অনেকদিন রেখে দিলে কেমন রং হবে?
৭) লাফিং গ্যাস আসলে কী?
৮) সাদা কপার সালফেটে জল মেশালে কোন রং হবে?
৯) কোন পরীক্ষার সাহায্যে নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রেট লবণ শনাক্ত করা হয়?
১০) পটাশিয়াম ফেরোসায়ানাইড কী?
১১) অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার তাপমাত্রা কত?
১২) হাইড্রোজেন শব্দের অর্থ কী?
১৩) হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনে কী ধরনের দস্তা ব্যবহার করা হয়?
১৪) মার্বেল পাথরের রাসায়নিক উপাদান কী?
১৫) কোনও বিক্রিয়ায় সদ্যমুক্ত হাইড্রোজেনকে কী বলে?
১৬) বায়ুর চেয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড কত গুণ ভারী?
১৭) গাইগার কাউন্টার কী কাজে লাগে?
১৮) কার্সিনোজেন কাকে বলে?
১৯) সমুদ্রের গভীরতা মাপতে কোন যন্ত্র ব্যবহৃত হয়?
২০) তেজস্ক্রিয়তা মাপার একক কী?
২১) রেড ডেটা বুক কী?
২২) বিজ্ঞানের কোন শাখার সঙ্গে ইকথিওলজি যুক্ত?
২৩) দ্বিপদ নামকরণের প্রবক্তা কে?
২৪) হার্বেরিয়াম কী?
২৫) যে লেন্সের প্রান্তভাগ মধ্যভাগের তুলনায় স্ফীত তাকে কী বলে?
২৭) গঙ্গোত্রী হিমবাহের উচ্চতা কত?

২৬) পশ্চিমবঙ্গের সংরক্ষণ তালিকাভুক্ত দু'টি প্রাণীর নাম কী?
২৮) বানম কার উপনদী?
২৯) কার্ডামম পাহাড়ের সবচেয়ে দক্ষিণের গিরিপথটির নাম কী?
৩০) উৎসের কাছে ব্রহ্মপুত্র কী নামে পরিচিত?
৩১) মধ্যপ্রদেশের কোথায় আকরিক লোহা পাওয়া যায়?
৩২) শিশির কখন তৈরি হয়?
৩৩) জব্বলপুর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
৩৪) জাপান দেশের আদিকালে কী নাম ছিল?
৩৫) স্ট্রেপটোমাইসিন কে আবিষ্কার করেন?
৩৬) কীজন্য শৈত্যের উৎপত্তি হয়?
৩৭) স্ফুটনে কী পরিবর্তিত হয় না?
৩৮) কুয়াশা কোথায় বেশি সৃষ্টি হয়?
৩৯) আণবিক বোমাতে কীরকম বিক্রিয়া ঘটে?
৪০) ব্যারাইটা কোন কাজে ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: ১) নাঙ্গাল ও নারোরা। ২) মিথেন। ৩) ব্লিচিং পাউডারের মতো ঝাঁঝালো। ৪) নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড। ৫) বাদামি। ৬) হলুদ। ৭) নাইট্রাস অক্সাইড। ৮) নীল। ৯) বলয় পরীক্ষা। ১০) একধরনের জটিল লবণ। ১১) ৩০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ১২) জল উৎপাদক। ১৩) বাণিজ্যিক দস্তার ছিবড়া। ১৪) ক্যালসিয়াম কার্বনেট। ১৫) জায়মান হাইড্রোজেন। ১৬) প্রায় দেড়গুণ। ১৭) পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা নিরূপণের কাজে। ১৮) ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থকে। ১৯) ফ্যাদোমিটার। ২০) কুরি। ২১) বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদগোষ্ঠীর নামের তালিকা। ২২) মাছ সম্পর্কিত। ২৩) ক্যারোলাস লিনিয়াস। ২৪) শুকনো উদ্ভিদের নমুনা সংরক্ষণকারী কেন্দ্র। ২৫) অবতল লেন্স। ২৬) ৬৬১৪ মিটার। ২৭) বাঘ ও ধনেশ পাখি। ২৮) চম্বল নদীর। ২৯) শেঙ্কোটা। ৩০) সাংপো। ৩১) দাল্লিরাজহারা। ৩২) মেঘে ঢাকা ঠান্ডা রাতে। ৩৩) নর্মদা নদী। ৩৪) য়ামাটো। ৩৫) বিজ্ঞানী ওয়াকসম্যান ৩৬) বাষ্পায়নের জন্য। ৩৭) উষ্ণতা। ৩৮) শিল্পাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে। ৩৯) নিউক্লিয়ার ফিশন। ৪০) কাচ তৈরিতে।

জেনারেল নলেজ

স্বাধীনতার কিছু গান

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বিপ্লবীরা নিজেদের আবেগ প্রকাশে নানা গানকে তাঁদের সংগ্রামের পথে সঙ্গী করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও দেশের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যে বারেবারে এই গানগুলোকে দেশের মানুষ গেয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মরণীয় দিনগুলোতে যেমন, প্রজাতন্ত্র দিবস বা স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি আমরা এইসব গানগুলোকে নিয়েই উদ্‌যাপন করি। এই গানগুলো আমরা সবাই জানি, গাই কিন্তু এদের তৈরি হওয়ার পেছনের ইতিহাসটাও রোমাঞ্চকর। এই গানগুলি কিছু কথা আমরা আজ জানব।

ভারতের জাতীয় সংগীতটি কী এবং এটি কার রচিত?

ভারতের জাতীয় সংগীতটি হল 'জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে'। এর রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতের জাতীয় সংগীতটি কবে প্রথম গাওয়া হয়েছিল?

জানা গেছে ভারতের জাতীয় সংগীতটি ২৭ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে কলকাতায় ভারতের 'জাতীয় কংগ্রেস'-এর ২৬তম অধিবেশনে প্রথম দেশের বিশিষ্ট শিল্পীরা একত্রে এই গান করেছিলেন।

'জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে' গানটি প্রথম কোন পত্রিকায় মুদ্রিত হয়?

'জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে' সংগীতটি প্রথম তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় মাঘ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়।

জাতীয় সংগীত নির্বাচনে কী নিয়ে বিতর্ক বেধেছিল?

'বন্দেমাতরম' ও 'জন গণ মন'-এর মধ্যে কোনটি জাতীয় সংগীত হবে তাই নিয়ে বিবাদ বেধেছিল। পরে জওহরলাল নেহরুর সমর্থনে 'জন গণ মন' জাতীয় সংগীত নির্বাচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় সংগীতটির কী নাম দেন?

রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় সংগীতটির নাম দেন 'The morning song of India'।

রবীন্দ্রনাথ ক'টি দেশের জাতীয় সংগীত রচনা করেন?

রবীন্দ্রনাথ ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রচনা করেন।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত কী এবং এটি প্রথম কবে গাওয়া হয়েছিল?

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। এটি ১৯০৫ সালে রচিত হয় এবং ১৯৭১ সালে তা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসাবে নির্বাচিত হয়।

জাতীয় সংগীতকে কীভাবে সম্মান জানানো হয়?

নির্দিষ্ট রীতি মেনে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়ে থাকে। জাতীয় সংগীত গাইতে হলে উঠে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে গাইতে হয়। এমনকী গানটি কোথায় বাজলেও একই সম্মান জানানো হয়।

কোন সংগীত তার ভাব, ভাষা ও দেশাত্মবোধক শব্দগ্রহণের জন্য কুড়িটি গানের মধ্যে প্রথম হয়েছিল? সংগীতটি কার দ্বারা রচিত?

'বন্দেমাতরম' সংগীতটি তার ভাব, ভাষা, দেশাত্মবোধ ও শব্দ গ্রহণের জন্য কুড়িটি গানের মধ্যে প্রথম হয়েছিল। সংগীতটি ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসে 'বন্দেমাতরম' গানের উল্লেখ আছে? এটি কত সালে রচিত?

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'বন্দেমাতরম' সংগীতটির উল্লেখ আছে। এটি ১৮৮২ সালে রচিত।

জানো কী বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে কীভাবে 'বন্দেমাতরম' গানটিকে আনা হয়েছে?

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে দেখা যায় 'বন্দেমাতরম' গান শুনে বিভ্রান্ত মহেন্দ্র প্রশ্ন করে মাতা কে? এ তো দেশ, এ তো মা নয়।' তার উত্তরে ভবানন্দ উচ্চারণ করেন আমরা অন্য মা মানি না, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

'বন্দেমাতরম' গানের প্রথম সুরকার কে ছিলেন?

'বন্দেমাতরম' গানের প্রথম সুরকার ছিলেন যদুভট্ট, রাগ ছিল মল্লার।

'বন্দেমাতরম' গানের প্রথম গায়কের নাম কী?

'বন্দেমাতরম' গানটির প্রথম গায়ক যদুভট্ট।

'বন্দেমাতরম' সংগীতটিকে কোরাস সুরের উপযোগী করে কে বাঁধেন?

'বন্দেমাতরম' সংগীতটিকে কোরাস গানের উপযোগী করে বাঁধেন প্রতিভা দেবী। তাঁর সুর ছিল বেহাগ।

বন্দেমাতরম' সংগীতে কোন মহান ব্যক্তিত্ব সুর দিয়ে তাকে সভা সমিতিতে সম্পূর্ণ গাওয়ার রেওয়াজ চালু করেন?

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এই গানের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে সুর দেন। পরবর্তীকালে ওই ধাঁচে বাকি অংশে সুর দেন তাঁর ভাগিনেয়ী সরলা দেবী। সেই থেকেই এই গান সভা সমিতিতে সম্পূর্ণ গাওয়ার রেওয়াজ চালু হয়।

'বন্দেমাতরম' গানটিতে প্রথম যখন অনেকে আপত্তি জানায় তখন বঙ্কিমচন্দ্র কী বলেছিলেন?

'বন্দেমাতরম' গানের ভাষায় যখন অনেকে আপত্তি জানান তখন বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন এ গানের মর্ম তোমরা এখন বুঝতে পারিবে না। যদি পঁচিশ বৎসর জীবিত থাক্, তখন দেখিবে, এ গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে'।

'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' গানটির রচয়িতা কে?

কবি ইকবাল লাহোরে বসে এই গান লিখেছিলেন।

কবে এই গানটি লেখা হয়েছিল?

১৯০৪ সালে এই গানটি লেখা হয়েছিল।

গানটি কোন ভাষায় লেখা?

গানটির ভাষা উর্দু।

'কীসের দুঃখ কীসের দৈন্য কীসের লজ্জা কীসের ক্লেশ' এই লাইনটি কোন গানের অন্তর্গত? এই গানের রচয়িতা কে?

উপরোক্ত লাইনটি 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গান থেকে উদ্ধৃত। এর রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটি কোন প্রেক্ষাপটে রচিত?

'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটি ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় রচিত।

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি কে রচনা করেন?

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি রজনীকান্ত সেন রচনা করেন।

'দীন দুখিনী মা যে তোদের/তার বেশি আর সাধ্য নাই'— এটি কোন গানের লাইন? কবে এই গান রচিত হয়েছিল?

'দীন দুখিনী মা যে তোদের/তার বেশি আর সাধ্য নাই'— গানটি মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানের অংশ। এটি ১৯০৫ সালে রচিত।

রজনীকান্ত সেন কোন বিখ্যাত গান রচনা করেন? তার আরেক নাম কী?

রজনীকান্ত সেন মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় গানটি রচনা করেন। তার আরেক নাম 'কান্তকবি'।

সমালোচক সুরেশচন্দ্র 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটির প্রশংশায় কী বলেছিলেন?

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মতো চুলচেরা সমালোচক এই গানের প্রশংশায় বলেন কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশি সংগীতের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে।

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি কখন রচিত হয়?

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি যখন রচিত হয় তখন স্বদেশি আন্দোলনে বিলাতি বস্ত্র বর্জনের এক সংকল্প ও ঘোষণা জারি ছিল। তারই ভাবনা থেকে এই গানটি রচিত।

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি কোথায় বসে রজনীকান্ত রচনা করেন?

কলকাতায় অক্ষয়কুমার সরকারের মেসবাড়িতে স্বদেশিদের হঠাৎ অনুরোধে তিনি এই গান লিখেছিলেন।

'একবার বিদায় দে মা' গানটি কার জবানিতে লেখা?

ভারতে প্রথম শহিদ সম্মান প্রাপ্ত ক্ষুদিরামের জবানিতে।

এই গানটি কার লেখা?

পীতাম্বর দাস এই গানটির রচয়িতা।

গানটির সুর দেওয়ার সময় কোন গানের সুর অনুসরণ করা হয়েছিল?

গৌর পদাবলির ধাঁচে এই গানে সুর দেওয়া হয়েছিল। মূল গানটি হল—একবার এসো এসো গৌরমণি'।

'মুক্তির মন্দির সোপানতলে' গানটি কার লেখা?

মোহিনী চৌধুরী 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে' গানটি লিখেছেন।

কে এই গানটি গেয়েছেন?

কৃষ্ণচন্দ্র দে এই গানটি গেয়েছিলেন।

'কদম কদম বড়ায়ে যা' গানটি আসলে কী?

এই গানটি আসলে একটি মার্চিং সং'(কুচকাওয়াজের সময় গাওয়া হয় যে গান) হিসাবে লেখা হয়েছিল।

কোথায় এই গানের উৎস?

নেতাজির তৈরি সেনাবাহিনীতে এর উসৎ। ক্যাপ্টেন রাম সিং ঠাকুরের নেতৃত্বে এই বাহিনী দেশের নানা জায়গায় রণসংগীত পরিবেশন করছিল। সেই সময়ে এই গানটা লেখা হয়েছিল।

গানটির রচয়িতা কে?

ব্রিগেডিয়ার রাম সিং এই গানটি রচনা করেছিলেন এবং সুর দিয়েছিলেন।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৫ এপ্রিল ২০১৭

উত্তরণ হেল্‌থ টিপস

গরমে ছাত্রছাত্রীদের শরীরের যত্ন

বছর বছর উষ্ণতার মাপকাঠি চড়ছে তো চড়ছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বলা ভালো। একে তো বৃষ্টির দেখা প্রায় পাওয়াই যায় না। তার ওপর তাপের হলকানি। টেকাই দায় হয়ে যায়। এর মধ্যে স্কুল, পড়তে যাওয়া, নানা রকম অন্যান্য কার্যকলাপে ব্যস্ত থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এমন দিনগুলোতে নিজের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের বেশি যত্নশীল হওয়া দরকার। গত বছরেও অতিরিক্ত গরম পড়ায় ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে অতিরিক্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। যেসব প্রাইভেট স্কুলে ছুটি দেওয়া হয়নি তারাও স্কুলের সময়কে এগিয়ে সকালে নিয়ে আসে।

সময়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের জীবনযাত্রা অনেকটাই বদলেছে। দৈহিক এবং মানসিক পরিশ্রমের ধরন ও পরিমাণও পালটেছে। ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক সুস্থতার জন্যে তাই তাদের প্রয়োজন খাবারদাবার, জীবনশৈলীর কিছু নিয়মকানুন মেনে চলার। রোজকার ঘুমানো, খাওয়া, বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে নিজস্ব একটা রুটিন মেনে চলার দরকার আছে। নিজের কাজকর্ম, বিনোদন, বিশ্রামের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার কথা মাথায় রেখেই এই রুটিন বানাতে হবে। যদিও স্কুল, পড়া, খেলাধুলো বা নাচ-গানের সময়ের পরিবর্তন করা যায় না, তবুও সম্ভব হলে এমনভাবে দৈনিক কাজের তালিকা বানাতে হবে যাতে রোদের সময়ে যতটা সম্ভব কম বাইরে বেড়ানো যায়। যত পড়ার চাপ থাকুক আট ঘণ্টা ঘুমানোর চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে শরীর সুস্থ না থাকলে পড়া, স্কুল সব ক্ষেত্রে মুশকিলে পড়তে হবে।

জল বোধ হয় গরমকালের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু প্রচুর পরিমাণে জল খেলেই হবে না। সেই জল হতে হবে পরিশ্রুত। দফায় দফায় জল খেতে হবে। একবারে অনেকটা জল খাওয়ার থেকে বারেবারে জল খাওয়া বেশি উপকারী। দিনে আট-দশ লিটার জল খেতে আজকাল সব ডাক্তাররাই বলছেন। তাই এই সময় স্কুলে বড় বোতল বা দুটো বোতল নিয়ে যাওয়া দরকার। জলের সঙ্গে গ্লুকোজ, নুন-চিনি, ডাবের জল নিয়ম করে খাওয়া দরকার।

সাধারণত স্কুল, নানা রকমের টিউশনের মাঝে খাওয়াদাওয়ার সময়ে চটজলদি খাবারের প্রতি আসক্তি বা খাবারের সময়ের মধ্যে ব্যবধান চোখে পড়ে। বারেবারেই সাবধান করা হয় এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে। তাই চটজলদি খাবার জিনিসে ঘরোয়া খাবার, গোটা ফল, হালকা মিষ্টি রাখা যেতে পারে। অনেক সাবেকি খাবার যেমন মুড়ি, চিড়ে, মুড়কি, মোয়া ইত্যাদি দেখলেই আমরা নাক সিঁটকাই বটে। কিন্তু বিস্কুট, কেকের থেকে গরমে এরা অনেক বেশি সহজপাচ্য হওয়ায় শরীরের পক্ষে ভালো হয়। বারে বারে খাবার খেলে সমস্যা কম হবে।

প্রতিদিনের খাবারে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার উপকারিতা সবাই জানে। ভিটামিন এ, সি, ই, লাইকোপিন, বিটাক্যারোটিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খেতে হবে। টমেটো, কালোজাম, তরমুজ, পেয়ারা, গাজর, লেবু, মিষ্টি আলু, পেঁপে, আম, দুধ খুবই উপকারী। এগুলো স্যালাড, লস্যি, ফ্রুট জুস, মিল্ক শেক ইত্যাদি বানিয়ে খেতে ভালো লাগে। সেক্ষেত্রে পুষ্টিও হয় আর শরীরে জলের ঘাটতিও মেটে। গরমকালের রসালো ফল যেমন তরমুজ, আনারস শরীরের পক্ষে খুবই ভালো।

আমাদের রাজ্য গরম প্রধান, তার সঙ্গে বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণও বেশি থাকে। তাই নানা রকমের জীবাণুর আক্রমণ গরমে হয়েই থাকে। এর জন্যে শরীরকে বেশি সচল রাখা দরকার। প্রতিদিন ব্যায়াম, হালকা খাওয়াদাওয়া দরকার। অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে না পারলে হালকা ব্যায়াম করা যেতে পারে। অল্প মশলাযুক্ত খাবার, তাজা সবজি বা মাছ দিয়ে রান্না করা তরকারি খাওয়াদাওয়া শরীরকে সতেজ ও বেশি কর্মঠ রাখে।

খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে পোশাকও গরমকালে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হালকা সুতির কাপড়, হালকা রং, ঢিলেঢালা পোশাক এই সময় স্বাস্থ্যের জন্যে দরকার। তাই গরমে নিজের সাজ পোশাক হবে পুরো অন্যরকম। স্কুলের পোশাকে জুতো মোজা আবশ্যিক কিন্তু গরমে তা একটু কষ্টকর হয়। তাই মোজা অবশ্যই সুতির মোজা পরতে হবে। যেভাবে শরীরকে যতটুকু আরাম দেওয়া যায় তার সবরকম উপায় অবলম্বন করা উচিত।

উত্তরণ এডু টিপস

কথায় কথায় বাড়ে

না না এ ঝগড়ার কথা না! কথার ওপরে কথায় তর্কাতর্কিতে কথা কাটাকাটি যেমন বাড়ে তেমনি কথায় কথায় জানার পরিধি বাড়ে। কথা বা শব্দভাণ্ডার বাড়াতে তো এইই লাগে। নতুন নতুন শব্দ জানা, বোঝা আর ব্যবহার করতে পারা। একজন শিক্ষিকা অভিযোগ করেছিলেন ছাত্রীরা নাকি উঠোন বা উঠোন নিকানো-র শব্দের মানে জানে না। তারা নাকি পাকা বাড়িতে থাকে আর ফ্ল্যাটে থাকে তাই এসব শব্দ বুঝতে ভারি মুশকিল হয়!

এ তো খুব লজ্জার কথা। এই শব্দতে লুকিয়ে আছে আমাদের সংস্কৃতি, আচার-আচরণ। তেমনি কিছু শব্দে লুকিয়ে থাকে ইতিহাস, কিছু শব্দে আবেগ, কিছু শব্দে ঠাট্টা— এমন কত কী। তাই শব্দের পর শব্দ জানতে থাকতেই হবে।

যে যেখানে যা বলল কান যেন তা গিলে খায়! কিছুই যেন কানের না শোনা থাকে। যত শুনবে তত নতুন নতুন শব্দ জানবে। শব্দ তো একটা খেলার মতো। 'আহা' শব্দ দিয়ে যেমন করুণা বোঝানো যায়, তেমনি বিরক্তি ও বাহবাও বোঝানো যায়। তাই থামলে চলবে না। শব্দের রূপের শেষ নেই। এর চর্চা করেই যেতে হবে। সুকুমার রায়ের নোটবই, মনে আছে তো? কাছে রাখতেই হবে। যেখানে যা নতুন তাই টুকে রাখো। এ নোটবই খাতা হতে পারে আবার ফোন বা ল্যাপটপ হতে পারে। তাতে আপত্তি নেই। কাজ হলেই হল।

শব্দের খেলায় যাকে সামনে পাওয়া যায় তার সঙ্গেই লেগে পড়তে হবে। যেমন শব্দ— তার থেকে বিপরীত, সমার্থক, পদ ইত্যাদি। আবার শব্দের অর্থ থেকে শব্দ খুঁজে বার করা। আবার অর্থ অভিনয় করলে তা দেখে শব্দকে খুঁজে বার করা। বাক্যরচনাও মন্দ খেলা নয়। সব কথায় কথা বাড়ানোর খেলা। অক্ষরের পর অক্ষর জুড়ে শব্দ বানানোর খেলা তো খুব পরিচিত।

আবার শুধু এই নয়, নানা কথা বকবকানির সময় আর বুঝিয়ে বলা না। এককথায় বলার চেষ্টা করা যেতে পারে। এতে শব্দের ভাণ্ডার বাড়তে থাকবে। আর যা পাবে হাতের সামনে উলটিয়ে দেখো তাই! পেলেও পেতে পারো নতুন কোনও শব্দ। তাই যা পাবে সব পড়তে থাকতে হবে। যেমন তেমন পড়া না চোখ কান খোলা রেখে পড়া।

শব্দ জানার দায়িত্ব কিন্তু সহজ নয়। অর্থ জানতে হয়, সঠিক ব্যবহার জানতে হয়, আর জানতে হয় বানান। তাই যা কিছু নতুন শেখা যাবে কদিন শুধু তার ব্যবহার করে যাও। লোকে চমকালে চমকাক, ঘাবড়ালে ঘাবড়াক, চটলে চটুক। শব্দটি কিন্তু ঠিকই এর মধ্যেই ফাঁকতালে মাথায় গেঁথে যাবে।

জেনারেল নলেজ

খেলার ছলে

একটা সময় ছিল মা-ঠাকুমারা মাটি দিয়ে, আটা দিয়ে বাড়ির মেয়েদের খেলার পুতুল গড়ে দিতেন। তাদের নকশা, সাজ, কিছুই খুব একটা কেতাদুরস্ত হত না। কিন্তু তাতেই কাপড় জড়িয়ে, রং চড়িয়ে চলত খেলা। সেই পুতুলের সই হতো, বিয়ে হতো। খেলা চলত ওই অবধিই, কারণ সেই পুতুল মেয়ে হোক বা মা সে কিন্তু শুধু ঘরকন্নার সঙ্গী। দিন বদলাতে থাকল। পুতুলে আসল হাজার রকমফের। প্লাস্টিক আসাতে সাধের পুতুল হয়ে উঠল স্বপ্নসুন্দরী। তার গায়ে রঙিন জামা। মাথায় সোনালি চুল। চোখ বন্ধ করে, খোলে। গালে গোলাপি আভা। পায়ে জুতো। সঙ্গে আছে গয়না। কারোর কারোর আবার মাথায় মুকুট বা হাতে ব্যাগ।

মনের মতো পুতুল পেয়ে এগিয়ে চলল খেলা। সেই পুতুল চুলও বাঁধে আবার শপিং-এও যায় আবার কখনও-সখনও চাকরিও করে। এই পুতুল আর হাতে তৈরি নয়। তৈরি হয় বিশাল বিশাল কলে, কারখানায়। কত কল ঘুরিয়ে, অঙ্ক কষে তার নির্মাণ। সে যেমন-তেমন ব্যাপার না। ফলে তার দামও চড়চড় করে বাড়তে থাকে। যতদিন যায় পুতুলের রং-ঢং বাড়ে আর দাম বাড়ে। গোল বাঁধল একটাই— সবাই তো আর তা কিনতে পারে না। আবার মাটির পুতুলেও কারোর মন ওঠে না। মাটির পুতুলের দিন ফুরল। তার নেই ছিরি, ছাঁদ। তাকে সবাই আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিল । সে হয়ে গেল ইতিহাস। যেহেতু সবার এই হালফ্যাশানের পুতুল কেনার রেস্ত নেই তাই অনেকেই এখন মন খারাপ।

একে পরীক্ষার নম্বরে রেহাই নেই তায় আবার পুতুল! সবকিছু নিয়েই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, যার অবশ্য কোনও মানে নেই, বাড়তে থাকল। কার কটা পুতুল, কেমন পুতুল তো আছেই তার সঙ্গে পুতুলের সংখ্যাই হয়ে গেল মা বাবার ভালোবাসার পরিমাপ, পুতুল মালকিনের ফুর্তি আর জাঁকের মাপকাঠি। এ রোগ এমন চারিয়ে গেল যে ফুটপাথে থাকা ছোট্ট মেয়েটিও যখন ডাস্টবিন ঘাঁটে অপেক্ষায় থাকে যদি একটা ভাঙা পুতুলও হাতে আসে! তার হয়তো মাথায় টাক, এক চোখ কানা, এমনকী তার একটা হাতও না থাকতে পারে। তাও সই। তবুও সে-পুতুল মেয়েটির কাছে স্বপ্নসুন্দরী।

খেলার পুতুল হয়ে উঠল ছোট ছোট মেয়েদের রোল মডেল। এই বাংলাতেও সাদা ফর্সা, সোনালি চুল, বিদেশি পোশাক পরা বিদেশি মেয়ের আদলে গড়া পুতুলের সঙ্গে মেয়েরা নিজেদের মিলিয়ে নিল। সত্যিই কি মিলিয়ে নিল? না কি ওই রকম হওয়ার আশ মিটিয়ে নিল?

এই যে নতুন রূপের পুতুল তার কিন্তু একটা ইতিহাস আছে। ১৯৫৯ সালে ৯ মার্চ একটা খেলনার প্রদর্শনীতে রুথ হান্ডলার নামে একজন আমেরিকান পুতুলনির্মাতা এক নতুন পুতুল আনেন। তার নাম দেন বার্বি। এই পুতুল নিছক খেলার পুতুল ছিল না। এ ছিল ফ্যাশন ডল। অর্থাৎ সে সাজবে সমকালীন সময়ের সর্বাধুনিক ফ্যাশানের ধারায়। নিমেষে বাজার মাত করল বার্বি। সাদা-কালো ডোরাকাটা ছাপায় সাঁতারের পোশাকে বার্বি সবার মন নিল কেড়ে। রুথের ছিল এক ছোট্ট মেয়ে বারবারা। সে আমাদের মাটির পুতুলের মতো কাগজের পুতুল নিয়ে খেলত। রুথ নজর করেন যে মেয়ের পুতুল কিন্তু সবসময় বয়সে বড় কোনও চরিত্রের রূপ নেয়। এরপর এক ট্যুরে তিনি জার্মান পুতুল বিল্ড লিলি, এও এক ফ্যাশন ডল, দেখেন। দেখেই তিনি বোঝেন যে এমনটাই তিনি চাইছিলেন তার মেয়ের জন্যে।

ফিরে এসে রুথ মেয়ের নাম অনুসরণ করে বার্বি ডাক নামে মেয়ের জন্যে পুতুল বানিয়ে ফেলেন। এই পুতুল খেলার সময় আমরা যা যা কল্পনা করি তাকে যেন সত্যি করে তুলল। যেমন তার রূপ, তেমনি তার গুণ। সে শুধু ছোটোদের খেলার সঙ্গী না। তারুণ্য পেরিয়ে সদ্য যুবতী হওয়া বার্বি বড়দেরও সংগ্রহে নিজের আখের গুছিয়ে নিল। দিনে দিনে বার্বির নানা রকমফের দেখা দিল । সে শিক্ষিকা, নার্স, বিমানসেবিকা, রকস্টার গায়িকা, এমনকী অ্যাস্ট্রোনটও। মেয়েদের পুতুল খেলা তাদের ক্ষমতা আর সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলল। সমাজে মেয়েদের অবস্থানের যে পরিবর্তন আসছিল বার্বি তাকে বেশ তুলে ধরল। কিন্তু তার সঙ্গে বার্বি পৃথিবীজুড়ে মেয়েদের বিশেষ শরীর কাঠামো, গায়ের রং আর শারীরিক সৌন্দর্যের মাপকাঠিকেই সেরা হিসাবে সবার মনে গেঁথে দিল। সে প্রথমে সুন্দরী তারপর কর্মক্ষেত্রে সফল।

তাই ভারতের মতো দেশেও যখন আধুনিক পুতুল তৈরি হল তখন তাতে একটু দেশীয় রং লাগালেও আসলে তা বার্বির কথা ভেবেই বানানো। নিজেদের থেকে অনেক আলাদা যা এ দেশের মেয়েরা জিনগতভাবে হয়তো কখনোই অর্জন করতে পারবে না; পুতুলখেলার ছলে তা আদায় করতে লেগে পড়ে। ফর্সা হওয়ার ক্রিম, অবৈজ্ঞানিক ডায়েটে নিজেদের জর্জরিত করে ফেলে। যে কোনও অর্থনৈতিক অবস্থানের মেয়েদের যেন একটাই চাহিদা। তার বদলে জ্ঞান, বুদ্ধি, শারীরিক সুস্থতা, কর্মক্ষমতা বা মানবিকতার চর্চা করা যে অনেক জরুরি তা আর মনেই থাকে না । যেমন, মিস ইউনিভার্স বা মিস ওয়ার্ল্ডের মতো খেতাবে মেয়েদের গুণ, বিদ্যা বুদ্ধি যাচাই করা হয় বটে তবে তা যাচাই করার প্রথম শর্ত একটা নির্দিষ্ট শারীরিক গঠন। অর্থাৎ কেউ যদি বেঁটে হয় বা মোটা এবং তার একইরকম গুণাগুণ থাকে তবুও তার বিশ্বের সেরা নারী হওয়ার যোগ্যতা নেই।

এ বড় সমস্যার কথা, আমি যা নই, আমি তা-ই হওয়ার যুদ্ধে মেয়েদের নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠছে। রাতে ঘুম নেই। হাজারো উপায়ের খোঁজ চলছে, কী করলে ঠিক ওই বার্বি হওয়া যাবে! এই ভাবনায় সবাই আক্রান্ত। এমনকী বার্বিও এই সব দেখে-শুনে ঘাবড়ে গিয়ে নিজেকে কালো বানিয়েছে, শ্যামলা বানিয়েছে। কিন্তু হলে হবে কী। যাদের হাতের সে খেলার পুতুল তাদের মন থেকে গেড়ে বসা ধারণা পালটাচ্ছে না। ব্যাডমিন্টন খেলোয়ার পিভি সিন্ধু বা কুস্তিগির সাক্ষী মালিকের কীর্তিতে আমরা বুঁদ না হয়ে বার্বির স্বপ্নে ডুবে থাকি। তবে এই চিত্র যে একেবারেই পালটাচ্ছে না তা বলা যায় না। কালো মেয়েরা বা না-সুন্দরী মেয়েরা নিজেদের এগিয়ে নিয়ে এসেছে। এখন অপেক্ষা শুধু সমাজের সব মানুষের, সেই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হওয়ার।

উত্তরণ

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৫ এপ্রিল ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ, তনুশ্রী দাস, বিপাশা চক্রবর্তী, দোয়েল দত্ত, শিবানী দাস, এনায়তি দেবদত্ত** (শিলচর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, সুদীপ্ত চৌধুরী, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, সৌম্য নিয়োগী, রাহুল চক্রবর্তী,** অতনু পাল (ফোটোগ্রাফার)

আল-গোর

বৃষ্টি ঘোষ

আমাদের এই বাসভূমি পৃথিবীর জলবায়ু ও পরিবেশ দিন দিন পরিবর্তিত হয়ে ধারণ করছে বিরূপ পরিবেশ। ক্রমশ ক্ষয় হচ্ছে পরিবেশের সহনশীলতার মাত্রা। মানুষ যেমন দায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য, তেমনি মানুষই আবার ভূমিকা রেখে চলেছে পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষায়। পৃথিবীর নানা দেশের কিছু কৃতি সন্তানেরা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো পরিবেশগত ইস্যু নিয়ে সচেতনতায় রেখে চলেছেন অগ্রগণ্য ভূমিকা। কেউ কেউ পরিবেশ নিয়ে করছেন দুর্বার আন্দোলন। তেমনই একজন জলবায়ু পরিবর্তন আন্দোলনের নায়ক আমেরিকার প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি 'আল-গোর'।

তাঁর নামটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে 'জলবায়ু পরিবর্তন আন্দোলন' শব্দটি। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ব্যয় করেছেন বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধের আন্দোলনের পিছনে। দাঁড়িয়ে ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। ইলেক্টোরাল ভোটে হেরে গেলেও তুমুলভাবে প্রচার চালিয়ে গেছেন জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিল পাশ, আইন প্রণয়ন ও এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। নিজেকে যুক্ত রেখেছেন বিভিন্ন ক্লাইমেট চেঞ্জ সলিউশন গ্রুপের সঙ্গে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে আল-গোরের বৈশ্বিক প্রচারই তাঁর কর্মপরিধির একটি বিশেষ দিক। নিজ টেলিভিশন চ্যানেল কারেন্ট টিভি ইন্টারঅ্যাকটিভ টেলিভিশন পরিষেবার জন্য পেয়েছেন 'অ্যামি অ্যাওয়ার্ড'। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র 'অ্যান ইনকনভেনিয়েন ট্রুথ'। এই ডকুমেন্টারি ২০০৮ সালে 'সেরা ডকুমেন্টারি' ক্যাটাগরিতে অস্কার পুরস্কার লাভ করে। ডকুমেন্টারিতে উঠে আসে পৃথিবীর বিশ্ব জলবায়ুর পূর্বাবস্থা থেকে বর্তমান দুরবস্থা। দুই মেরুর বরফ কী হারে গলছে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতাই বা সমানুপাতিক হারে কীভাবে বাড়ছে তার একটি দারুণ গ্রাফিক্যাল চিত্র। প্রাণিজগৎ এতে কীভাবে হুমকির মুখে রয়েছে তারও একটি চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে ওই ডকুমেন্টারিতে। বিশ্ব উষ্ণায়নের মাত্রা দিন দিন থার্মোমিটারের স্কেল ছাপিয়ে যাচ্ছে, তাই পরিষ্কার তুলে তুলে ধরা হয় 'অ্যান ইনকনভেনিয়েন ট্রুথ'-এর দর্শকদের সামনে।

পরিবেশের এই নেপথ্য নায়ক নিজ প্রতিষ্ঠান থেকেই নিজের খরচে বিভিন্ন স্কুল, কলেজে বিতরণ করেছেন পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক নানা রকমের শিক্ষণীয় ডকুমেন্ট-সহ প্রচারপত্র। রাজনীতির মাঠে থাকলেও তিনি সব সময় পরিবেশ সচেতনার বাণী সবার মধ্যে বিলিয়ে দিতে সচেষ্ঠ ছিলেন। সারা বিশ্বব্যাপী তিনি কনফারেন্স ও সেমিনার এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্ব প্রদান করে গেছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ডের জন্য বিশেষ স্বীকৃতি স্বরূপ 'ইন্টারগভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ'-র সঙ্গে যুগ্মভাবে ২০০৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান গোর।

আল-গোর সম্পর্কে আরও কিছু কথা

আল-গোর জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৮ সালের ৩১ মার্চ আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি শহরে। পুরো নাম অ্যালবার্ট আর্নল্ড আল গোর। তিনি ছিলেন আল গোর সিনিয়রের দ্বিতীয় পুত্র। শৈশব কাল কাটে ওয়াশিংটন ডিসি শহরেই। স্কুল জীবন পার করেন ওয়াশিংটন শহরের সেন এলাবামা স্কুলে। খেলাধুলায় ছিলেন সমান পারদর্শী, ছিলেন স্কুল ফুটবল দলের অধিনায়কও। খেলাধুলা-সহ সব ধরনের কাজেই তিনি ছিলেন দারুণভাবে আগ্রহী। হার্ভার্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ সালে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি ভ্যান্ডারবিল্ট ল স্কুল থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন।

এরপর তিনি প্রবেশ করেন রাজনীতির দুরন্ত মাঠে। ক্রমশ একজন সুশীল রাজনীতিবিদ, অ্যাডভোকেট ও লোকহিতৈষী হিসাবে পরিচিত হতে থাকেন আর-গোর। তবে যে মানুষটি বিশ্বব্যাপী ক্লাইমেট চেঞ্জ আন্দোলনের নায়ক হিসাবে পরিচিত, সেই আল-গোর কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ে খুব একটা পটু ছিলেন না। এমনকী, গণিতের প্রতিও তাঁর কিছুটা ভীতি ছিল। যার হাত ধরে তিনি বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সচেতনতার দুনিয়ায় পা রখেন, তিনি ছিলেন আল-গোরের কলেজ প্রোফেসর রজার রেভেল। রজার ছিলেন একজন খ্যাতনামা সমুদ্র গবেষক এবং জলবায়ু পরিবর্তন তত্ত্ববিদ। তিনিই আল-গোরের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন সেই বোধ, উদ্বুদ্ধ করেন পরিবেশ বিষয়ে সচতেনতা সৃষ্টির জন্য নিবেদিতপ্রাণ হতে। চারদিকে যখন এহেন পরিস্থিতি, তিনি জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য পরিবেশ বিষয়ক ইস্যু নিয়ে কাজ করার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ধীরে ধীরে তিনি দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক কর্মকাণ্ডের পরিধির শাখা।

১৯৭৭-৮৫ সাল পর্যন্ত গোর ছিলেন মার্কিন টেনেসি অঙ্গরাজ্যের কংগ্রেসম্যান। তবে তিনি সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেন মার্কিন সিনেটর হিসেবে (১৯৮৫-৯৩)। এছাড়া, তিনি ছিলেন সাড়াজাগানো অ্যাপল ইনকর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য। উপদেষ্টা হিসাবে ছিলেন গুগলের মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সময়ে আল-গোর আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি (১৯৯৩-২০০১) হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও, শিক্ষা প্রদানের প্রয়াসে আমেরিকার বেশ কয়েকটি নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন আল-গোর।

দিকে দিকে জ্বলুক আলোক শিখা

পৃথিবীর নানা দেশের কৃতি সন্তানেরা তাঁদের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক, পরিবেশ সচেতনতা মূলক কর্মকাণ্ডের জন্য লাভ করেছেন বিশ্ব স্বীকৃতি। তাঁদের কেউ কেউ সমাজসেবার সঙ্গে, কেউ অর্থনীতির কল্যাণে, কেউবা বিজ্ঞানের কল্যাণে সমগ্র জীবনব্যাপী কাজ করে গেছেন। আমাদের এই বাসভূমি ও তাঁর পরিবেশ এবং জলবায়ু আমাদের এমন একটি অঙ্গ, যার অল্প ক্ষতিও সমগ্র মানব জাতির জন্য অভিশাপ স্বরূপ। এই পরিবেশের টেকসই রক্ষার জন্য ও ভবিষ্যৎ জীবনের স্থায়ী বুনিয়াদ গঠনের লক্ষ্যে যুগে যুগে যাঁরা কাজ করে গেছেন, আল-গোরের মতো সেই সব মহারথীদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এভাবেই দিকে দিকে আলোক শিখা জ্বলুক প্রতিটি প্রাণে।